সময় ও অসময়ের সঙ্গী
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে

"সময়, আমার সময়" লেখাটি আখ্যায়িকা ততটা নয়, যতটা আলেখ্য। কোন্ কালের, সেটা এই রাজ্যের পাঠকেরা অনায়াসেই সনাক্ত করতে পারবেন। স্থান, পাত্র ইত্যাদিকে চেনাও শক্ত হবে না।

রচনা মোটামুটি বছর খানেক আগে। সেই হিসাবে "অপার্থিব" নামে আমার নাটকটির এটি পরিপূরক। দুইয়ে মিলে এক।

"সময়, আমার সময়"। বলা বাহুল্য সে-সময়টা সুসময় ছিল না। কিন্তু গ্রন্থাকারে ছাপতে দেবার পূর্ব মুহূর্তে টের পাচ্ছি এ-সময় আর সে-সময় নয়। স্রোত সরে এসেছে, আসছে।

সম্পূর্ণ বহমান নদীটির ধারা অতএব এই লেখাটায় ধরা নেই, থাকল না। বড় জোর একটা ঘাটের ছবি আঁকা গেল। সেই ঘাট, যা পেরিয়ে এসে থাকতে পারি, কিন্তু ছিল। কিংবা আছে—একটুখানি উজানেই।

A guiltless death I die

—*Othello*

॥ এক ॥

একটা দমকা হাওয়া উঠেছিল এইমাত্র। শুয়ে শুয়েই সে টের পেল, চমকালো চোখ না খুলেই। চমকানো ব্যাপারটা, সে ইদানীং দেখছে, তেমন শক্ত কিছু নয়। সহজেই হয়ে যায়, শারীরিক কোন কোনও কৃত্যের মতো, যে-কোন, শব্দে, যে-কোনও দৃশ্যে। কানে ঠিক আসছে না, তবুও সে শোনে, আবার যা সত্যিই দ্যাখেনি, তাও দেখেছে বলে ভাবে, এবং কাঁপে।

আজকাল এটা হচ্ছে। সুতরাং এইমাত্র যে হাওয়াটা কাচের শার্সি-টার্সিতে একপ্রকার থরথর সুড়সুড়ি তুলে চলে গেল, তাকে সে দেখতে পেল। হ্যাঁ, হাওয়াকেও সে অধুনা দ্যাখে। হাওয়া কেমন? এই কিছুকাল আগে হুলেও সে বলত, উঠতি বয়সের মতন। কেন যে হঠাৎ আসে, ক'দিনের জন্যে হুড়মুড় দুদ্দাড় সব কাঁপিয়ে টাপিয়ে, ধুস!, চলে যায়, মানে হাওয়া হাওয়া হয়ে যায়, সেই রহস্য নিয়ে সে রীতিমত বিস্মিত হত। কিন্তু হালে আর হাওয়াকে উঠতি বয়সের মতো ভাবা যায় না। এখন, যেই জানলা টানলা কাঁপে, রাশ রাশ মরা পাতা মুখ থুবড়ে পড়ে তাজা ঘাসে, সর্-সর্, সর্-সর্, প্রেতের মতো হালকা চালে কী যেন চলে যায়, তখন, না, না, নর্তকী নয়, হাওয়াকে একটা খোঁড়া বুড়োর মতো মনে হয়। নাটকের কোন দৃশ্যে যেনঃ নড়ি হাতে এক থুত্থুরে কেউ স্টেজের এক দিক দিয়ে ঢুকে অন্য দিকে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে যাচ্ছে, যার মুখে কোনও সংলাপ নেই; হঠাৎ হাওয়াকে আজকাল সে এই রকম দ্যাখে।

সে কোথায় আছে, এতক্ষণ কোথায় ছিল? মাথা তুলে দেখল, মোম-গলানো খানিকটা চাঁদের আলো, ওদের আশমানি মুলুকে বোধহয় বন্ধ-টন্ধ নেই তাই নিয়মিত উদয়-অস্ত এখনও হচ্ছে, ফিকে আলো গাছের পাতায় পাতলা একটা ক্রীমের মতো লেগে আছে। কোথায় আছে? চরাচরের চেহারা দেখে ঠিক চেনা গেল না, সে অতএব ফের চাদরটা টেনে মুড়ি দিয়ে ফেলল। মনে পড়েছে। এটা একটা বারোয়ারি বাড়ির চিলেকোঠা, যেখানে সে গা-ঢাকা দিয়ে আছে।

সময়ের সঙ্গে আমি আর সহবাস করিনা, সে সখেদে ভাবল, তাই পালিয়ে থাকি, সব এড়িয়ে বেড়াই, সে চাদরের তলাতেই দুটো হাত দিয়ে বুক চেপে ধরল, "তোমাকে সইতে পারছি না আর, সময়, আমার সময়" কাতর এই উক্তিটি অস্ফুট উচ্চারণ করল। এ লাইনটা কি কবিতা? কবিতা বা কবিতার মতো যাই হোক, তার এই ঠাসা বন্ধ মগজে কী করে ঢুকল? এই সব লাইন

অদ্ভুত, বন্ধ ঘরেও মাছির মতো কোনও ফাঁকে ঢুকে পড়ে। তারপর ভন্‌ভন্‌ ভন্‌ভন্‌ ঝাঁ-ঝাঁ ঝাঁ-ঝাঁ, ধু-ধু ধূসর যন্ত্রণা। "তোমাকে ধরতে পারছি না আর, সময়, আমার সময়"—এর মানে কী। সময় যদি নেই তবে কাকে নিয়ে আছি? বোধহয় স্মৃতিতে, বোধহয় স্বপ্নে। আজকাল মনটা বেশির ভাগ সময় খুদের মতো স্মৃতি খুটে খুটে কাটে, চড়ুইপাখি যেন। আজকাল অনেক সময়ই চলে যায় স্বপ্নের তলায়, যেন টলটলে এক দীঘি, সেখানেও দিব্যি কাটে। আমি যেন এক খল-স্বভাব অবিশ্বস্ত পুরুষ, তাই আমার বিবাহিতা সময়কে পরিত্যাগ করে অবিরত স্বপ্নে আর স্মৃতিতে উপগত যাচ্ছি, তাই কি?

"তুমি কেন স্বপ্নের মতো অলীক হও না, কিংবা স্মৃতির মতো সুন্দর, সময়, আমার সময়?"—কথাটাকে সে ছন্দে গেঁথে ফেলতে চাইছিল, আলগা ভাবে আউড়ে আউড়ে "যদি হতে, তবে আমি তোমাতেই নির্ভয়ে বর্তমান থাকতে পারতুম"। হল না, ছন্দ হল না, একেবারে গদ্য নীরেট, ইটের মত ঠক ঠক আওয়াজ করে, করুক, তবু এর ভিতরের কথাটা পদ্যই।—"সময়, আমার সময়", যেন মেলেদেওয়া একটা শাড়ি উড়ে উড়ে নড়ছে, সেই রকম শুনতে। স্বপ্ন, স্মৃতি। তলিয়ে যাওয়া, খুটে খাওয়া—তৃপ্তিতে, নির্ভয়ে, তার এখনকার জীবন। নির্ভয়ে শব্দটা ভাবতেই সঙ্গে সঙ্গে মনে উঠে এল আর একটা শব্দ—"ভয়, হ্যাঁ, ভয়ও আছে। পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে পাখির ডাকে জাগার মতো, ভয় নিয়ে রোজ শুয়ে পড়ে, ভয়কে জড়িয়েই জেগে ওঠা—ইদানীং তাই নয়?

"সময় তোমার অন্য নাম কি ভয়?"—আর একটা লাইন, আসছে একটার পর একটা, কিন্তু মিলছে না।

তার চেয়ে স্বপ্নই ভাল, একটু আগে যেখানে ছিল। মানুষ নয়, কোনও বানানো কাহিনীর চরিত্র হয়ে। সেই চরিত্রটাকে নিয়ে চমৎকার একটা আমেজের পরিবেশ বুনছিল। যেন কা-কা ডাকা সাত সকালে, দোতলা বাসটা (লাল, না নীল?) মচ মচ করে আধো অন্ধকারটা খোলামকুচির মতো ভাঙতে ভাঙতে, শুকনো ডাল আর পাতার স্তূপে হাতি যেমন, এসে পড়ল। ব্রেক কষল শত শত ইঁদুরের বাচ্চাকে থেঁতলে দেওয়ার মতো শব্দ করে। আড়চোখে চেয়ে ও দেখে নিল তাকে, বউ ও তার বউ-ই তো, অথচ হাত বাড়াতে বউ যেন সরে গেল। আরে না, না, শুচিবাই নয়, ছোঁয়াছুয়ির বাই বউ-এর নেই। কোন জন্মে বিয়ে হয়েছে, গায়ে গা ঠেকলে কি ফোসকা পড়বে? মুখের কাছে মুখ নেবে কি নেবে না সে ভাবছিল, সেই বিলিতি নাটকে নায়কের বিখ্যাত দ্বিধার মতন, ধ্যুৎ, মুখ নেবে কি, পচা-পচা ঝিম-ধরানো গন্ধ যে। ঠিক ঠিক, টাইমপিসটা বলল, ঠিক ঠিক, সারা রাতে ওর দাঁতের মৌলিক আধারে গন্ধ জমেছে, কোনও মেয়েকেই সকালে চুম্বন অসম্ভব, এই নিদারুণ জ্ঞানের শলাকায় বিদ্ধ তার

চোখের পাতা জ্বলতে থাকল।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই ছটফট করছিল সে, বউকে কাছে টেনে নেওয়া গেল না বলে। নিত্য কৃত্য, তবু দ্যাখো, তাতেও বাধা কত। এ-জীবনে, হায়, কিছুই করা যায় না। সামান্য একটু ভালবাসা, তা-ও তৈরী করা হল কি? ভালবাসা থাকলে এই ঘর, ওই বিছানা, যা আমাদেরই রচনা, সেখানে তৎক্ষণে একটি চুম্বন অবশ্যই দুর্গন্ধ লঙ্ঘন করত।

সদ্যোজাত সেই চরিত্র তার কানে কানে জানাল, "এই নিয়েই একটা গল্প লিখে ফেল। এক ব্যক্তি অতি-প্রত্যুষে তার পত্নীকে চুমু খেতে পারেনি, সেই কাহিনী।"

এর পরটা, সেই চরিত্র বলে গেল, এই রকম হয়...স্ত্রীকে ঠেলে ঠুলে তুললাম। যে ধিক্কারটা ভিতরে ভিতরে হিক্কা তুলছিল, সেটার কথা ওকে বললাম। ও বুঝল না, চোখ কচলাল। অথবা কী যেন বুঝে দাঁতে অনেক ফেনা বানিয়ে মুখ ধুয়ে এল। তকতকে ঠোঁট দুটি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "খাও, এইবার খাও।" কী বলব, ভিতরটা যেন ভিরমি খেয়ে গেল। ও রগড় করছে, না সত্যিই চুমু খেতে সাধছে বোঝা যাচ্ছিল না। ওই মেয়েটা, মানে বউটা, ন্যাকা, না বোকা, টের পেলাম, অ্যাদ্দিনেও জানি না। তা-হলে ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? এক ছাদের তলায় বাস করছি, এক শয্যায় শুচ্ছি—কিসের অধিকারে? লেন-দেন কতটুকু? কিছু নয়, মনকে বলা যাক, কিছু নয়। বউ তো না, ও আমার বাথরুম। বাথরুমের সঙ্গে কতটুকু আর থিক্‌থিকে সম্পর্ক হয়!"

স্বপ্নের মধ্যেই অবশ্য এই সংলাপ ঘটছিল, অথবা সে ঘটাচ্ছিল তার কল্পনায়, জীবন থেকে সরে গিয়ে জীবনকেই একটু মশকরা, মুখ ভ্যাংচানো, মন্দ মজা না। যেন আধভর্তি বাথটবে গলা অবধি ডুবিয়ে বুড়বুড়ি কাটা। কিন্তু আজকাল আর সে-সব বুড়বুড়ি স্থায়ী হচ্ছে না, তৈরী হয়েই ফেটে ফেটে যাচ্ছে। যেমন আজকে গেল। ওই স্বপ্নটা ফট-ফট-ফটাস হল, দূরের কার চিৎকারে; ঘরটা বারুদের গন্ধে ভরে গেছে? দূর, দূর, তাও তো না, সে শুয়ে আছে একটা ব্যারাক-বাড়ির চোরা-কুঠুরিতে—এখানে তার অস্তিত্বের কথা কেউ জানে না। জানে, অন্তত একজন। তার ভয়। ছায়ার মতো, গোয়েন্দার মতো, তার পিছু নিয়ে এখানে এসেছে, ঢুকে গেছে খাটের তলায় তোষকের নীচেও ছারপোকার মতো ছেয়ে গেছে। কোথাও খট্ করে শব্দ হলেই সে চমকায়, মনে হয়, তারা এসেছে, কারা এসেছে। নামহীন কায় কতকগুলি, সে চেনে না, কিন্তু তারা চিহ্নিত করে রেখেছে তাকে, হিংসার ছুরি দিয়ে ছুঁচলো করা তীরে। ভয়াবহ একটা পট দুলতেই থাকে, যতক্ষণ না চেতনা ঘুমের কৌটোয় আটকে যায়, কিংবা সিঁড়ি দিয়ে শেষ পায়ের শব্দের

ওঠা-নামা থেমে যায়, ততক্ষণ সে চোখ দুটিকে মশাল, কান দুটিকে সঙিন করে রাখে। চৌকাঠের তলা দিয়ে সঞ্চারিত অনেক পায়ের আভাস পাওয়া যায়। ভয়াবহ—ভয়ের আবহ।

সারা রাত এইভাবে কাটে, তারপর সকাল। সকাল মানে শিশির, সকাল মানে শিরশিরে বাতাস, সকাল মানে আলো। কিন্তু সকালের যে আর একটা মানেও ছিল—সাহস—সেই মানেটা কোথায় গেল?

নেই, কোথাও নেই, সাহস নেই। স্বপ্ন, স্মৃতি, এই সব তবু একটু টিঁকে আছে, কিন্তু থাকছে না, একটু ভরে উঠতে না উঠতেই মাটির কলসীর মতো ভেঙে যাচ্ছে; কিংবা অলক্ষণার হাতের শাঁখার মতো।

একটা ছটফটে প্রবল প্রাণ এখন সব অভ্যাসে ইস্তফা দিয়ে হন্যে কুকুরের মতো ফিরছে। পারিয়া, বেওয়ারিশ—কেউ তাকে চায় না। ভীত একটা ইঁদুর সে—গর্তে ঢুকেছে। শরীর, শরীর—সর্ব সুখের আধার, কিন্তু সেই শরীরটাই আজ ল্যায়াবিলিটি। সারা দিন তাকে মাথায় করে ফেরা, তাকে নিয়ে ঘাটে ঘাটে ঘোরা, না, না, সে আর ঘুরছে না তো, লেত্তিতে জড়িয়ে গিয়ে লাট্টুটা কাৎ হয়ে আছে, এখন স্থির, সে আর তার শরীর। শরীরটাকে কোথায় নামিয়ে দিয়ে যাবে, নিস্তার পাবে! জানে না, যাকে নামাবে সে ভাঙাচোরা, না আস্ত; মরা, না জ্যান্ত।

এই তো ঠুক করে এখন শব্দ হল দরজায়। সে জানে কী। কাগজ। সকালের খবরের কাগজ নীচের দারোয়ানটা দিয়ে গেল।

দিক, সে উঠবে না। কিছুই পড়তে মন চায় না, আজকাল বুকে ধাক্কা লাগে। খবরের কাগজ মানে আগাগোড়া হত্যার ফর্দ, বাইরের জগৎটাকে ভিতরে টেনে নিয়ে আসে। তার চেয়ে থাকুক পড়ে ওইখানে ওটা; কাগজটা। ইঁদুর বড় জোর কাগজ কাটে, পড়ে না।

উঠে গিয়ে জানলার পর্দা পুরো টানটান টেনে দিয়ে সে শুয়ে পড়ল। আরও ভালো করে মুড়ি দিয়ে, পর্দা পুরো টেনে দিলেই সে দেখেছে, কী আশ্চর্য, এই ঘরটা তৎক্ষণাৎ ছমছমে ছিমছাম, একেবারে অন্ধকার। তখন আর ঘরটার বয়স বাড়ে না, সময়ের সময় বাড়ে না, এইভাবেই যদি বন্ধ হয়ে থাকি, অন্ধকার এই ঘরে বাকী জীবনটা, তাহলে আমারও বয়স বাড়বে না—সম্ভবত যা আছি, তাই থেকে যাব। বাইরে শরৎ কেটে আসবে হেমন্ত, পৌষ প্রখর হবে, টের পাব না, ঘরের ভিতরটা কিছু জানবে না। আর শীতই যদি আসে, বসন্ত তবে আর কত দূর, ফুলটুল যা ফোটার ফুটে মোচ্ছব হবে। কৃষ্ণচূড়া শিমূল পলাশ পাল্লা দিয়ে লালে-লাল হোলি খেলবে, খেলুক, জানালা খোলা হবে না। পলাতক এই প্রাণীর নিরন্তর সহবাস চলবে তার ভয়ের সঙ্গে; যত স্নায়ু অবশ, অলস, সেই ভয়ের ঘুষ খেয়ে চুপ। বন্ধ্যা সহবাস, কিছু প্রণীত

হবে না।

মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকাও যেন এক প্রকার নিরাপত্তা কেনা, সে ভাবছিল। যেন তারা যদি আসে, ঘুরে ঘুরে দেখে চলে যাবে, চিনবে না, অথবা দেখেও দেখবে না।

কী উপায়ে চেনে ওরা, আততায়ীরা, তার কাছে স্পষ্ট নয় এখনও। ওরা কি মুখে টর্চ ফ্যালে, কিংবা চিনে নেয় উলকি-জরুল তিল ইত্যাদি কোনও দেহচিহ্ন থেকে, তেমন কোনও বিশিষ্ট দেহ-লক্ষণ আমার আছে কি, সে ভাবল; থাকলেও আমি তো জানি না। নিহত হলে আমি তবে সনাক্ত হব কোন্ পদ্ধতিতে, এই অসহায় চিন্তা তাকে ব্যাকুল করছিল; এতটা অনিশ্চয়তা নিয়ে মরা যায় না।

মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকার সুবিধা যত বিপদও তার চেয়ে কম কিছু না, এই বিচার তাকে পুনরায় অস্থির করে দিতে থাকল, ঘুমন্ত বিজলী পাখা যেমন টেবিলের চাদর, আঁচড়ানো চুলটুল এলোমেলো করে দেয় সেও সেই মতো বিশৃংখল ভাবছিল। সুবিধা এই, মুড়ি দিয়ে থাকলে চট করে সে নজরে পড়বে না, যেহেতু বিছানার অংশ হয়ে যাবে, দিবালোকে চাঁদের মতন। বিপদ এই, সে-ও কিছু দেখতে পাবে না, কারা ঢুকল, তাদের হাতে চকচকে বস্তু-গুলো কী; একেবারে একচক্ষু হরিণের দশা হবে। মৃত্যুর কাছে অপ্রস্তুত ভাবে হাজির হওয়া—এর চেয়ে অভব্যতা নেই, সেটা যারপর নাই অবৈধ, উদ্ধত, বিধি-বহির্ভূত।

একটু পরে ঠক ঠক শব্দ আবার, তাকে এবার উঠতেই হল। তাড়াতাড়ি রাতের ছাড়া জামাটা গায়ে গলিয়ে দিল, চিরুনিটা বুলিয়ে নিল চুলে, সব অহেতুক, দরজা অবধি এগিয়ে কবাটে পিঠ দিয়ে ধরা গলায় বলল, "কে?"

কে? যতদূর সম্ভব রাশভারি ভাবে সে বলতে চেয়েছিল, নিজেকে কণ্ঠস্বরে পুরোপুরি কুড়িয়ে নিয়ে, তবু একটা আর্ত, চেনা আওয়াজ কী করে বেরিয়ে গেল, সেই জানে।

—আমি। সাড়া এল বাইরে থেকে।

আমি? সবচেয়ে অবিশেষ আত্ম-পরিচয় এই "আমি"। আমি তো সকলেই, যার যার নিজের কাছে। সুতরাং "কে?" আবার বলতে হল তাকে এবং আবার শোনা গেল "আমি", এবার স্পষ্টতর স্বরে। এবং সে চিনতে পারল।

বিনীতা হাসছিল রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে, অথবা বাইরের ছড়ানো রোদ্দুরই তার মুখটাকে হাসিহাসি করে দিয়েছিল, সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত কোনও সিদ্ধান্তের আগেই বিনীতা ঘরে ঢুকে গেছে, হাতে চায়ের ট্রে।

—বাব্বা এত ঘুম? বিনীতা ট্রে-টা নামিয়ে রাখল নীচু টেবিলে, মুখ তুলে শাড়ির কোণে কপাল মুছল। তখনও হাসছিল। আর তখনই বোঝা

গেল, রোদ্দুর খয়রাত করেনি, হাসিটা ওর নিজেরই।

—বেলা হয়ে গেছে, বিনীতা চা ঢালছিল, চা ঢালা আর নুয়ে পড়ে বাগানের গাছে জল দেওয়া, হুবহু এক ছবি, মেয়েদের একই পোজ, সে অবাক হয়ে দেখছিল।

বিনীতা কে, এখানে কেন আছি, এই সব অনুভব, স্মৃতি, প্রতীতি মিলে মিশে এক হয়ে যাচ্ছিল, যেহেতু তখনও ঘর অন্ধকার-অন্ধকার, পর্দা টানাই আছে, জানালা খোলা হয়নি। এই যে মেয়েটি, যে এই সকালে আমার জন্যে চা করে এনেছে, বয়ে এসেছে চিলেকোঠা অবধি, এখন আমারই সামনে অসঙ্কোচে বসে আছে, একে আমি কতটুকু চিনি? চিনতাম না অন্তত, ক'দিন আগেও মুখচেনা ছিল মাত্র, এখনও যা চিনি, তা ওই চা নিয়ে আসা-টাসার মতো হালকা রুটিনের মধ্য দিয়ে। যাদের চিনতাম, খুব বেশি চিনি, তারা কোথায়? আমার কথা ভেবে কার, ঠিক এই মুহূর্তে চোখের পাতা কাঁপছে! টেলিপ্যাথি বলে জগতে প্রকৃতই কিছু আছে কি নেই, তাই আমি জানি না।

—বিনীতার চোখের পাতা কিন্তু কাঁপছে। কার জন্যে যে কবে কোথায় কী সংস্থান থাকে, কে জানে, আশ্চর্য অপ্রত্যাশিত ব্যাপার সব—শিশুর জন্যে মাতৃবক্ষে স্তন্যের মতন; অথবা সন্ধানী বালি খুঁড়ে খুঁড়ে হঠাৎ ঠান্ডা জল পেয়ে যাওয়া।

—চা জুড়িয়ে যাচ্ছে, বিনীতা বলছিল, অন্য দিকে চেয়ে, তখনই সে টের পেল বিনীতার মুখটা পাশ থেকে দেখতে চমৎকার, আংশিক বলেই উজ্জ্বল লাগে, এখন অন্য দিকে চেয়ে আছে কিন্তু বলছে আমাকেই লক্ষ্য করে, আসলে আমাকে দেখছে ও, এ এক অদ্ভুত ক্ষমতা, অন্য দিকে তাকিয়েও দেখতে থাকা, একমাত্র মেয়েরাই যে ঐশী শক্তির অধিকারিণী হতে পারে, হয়ে থাকে।

—বেলা কত? সে বালিশের তলা থেকে ঘড়ি বের করতে করতে বলল।

—অনেক। রেডিও-তে রবীন্দ্রসঙ্গীত কখন শেষ হয়ে গেছে।

—রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে বেলার হিসেব কর তুমি? ওই গান এত ভালো লাগে?

বিনীতা চোখ তুলে বললে, আপনার লাগে না?

—লাগে। খুব ভালো লাগে। কিন্তু এই ভাললাগাকে আর খুব বেশিদিন বোধহয় রাখা যাবে না। বিনীতা, যে-সময়ের মধ্যে আমরা প্রবেশ করছি, তাতে কোন ভালবাসাকে বোধহয় বাঁচানো যাবে না। রবীন্দ্রনাথও চলে যাবেন, গিয়েছেনও বোধকরি। তিনি গেলেও, আমরা আছি। কিন্তু কী নিয়ে থাকব বলতো, উপাদানে-উপকরণে আরও কত দরিদ্র হয়ে?

—বক্তৃতা দিচ্ছেন, ফের? আপনাকে আমি বুঝে ফেলেছি। খুব নারভাস মানুষ তো, কথা ছুটিয়ে সেটা ঢাকতে চান। যেমন আমার দাদা। বাইরে এত চোটপাট কিন্তু ভেতরে-ভেতরে ছিল ভীতু। তাই সব সময় একটা সিগারেট ধরিয়ে রাখত।

এই বয়সেই এত বুঝে ফেলেছে বিনীতা, অভ্যাস এবং কয়েকটা আচরণের যান্ত্রিকতা থেকে মানুষকে? সে মনে মনে জিজ্ঞাসা করছিল আর মনে মনেই সম্পূর্ণ করে ফেলছিল বাধাপ্রাপ্ত বাক্যটা, বিনীতাকে যা বলা গেল না—(এই সময়, এই সময়টা যেন লম্পট এক দস্যু, যার খপ্পরে আমরা পড়েছি। একটা অন্ধকূপে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রত্যেকের প্রত্যেকটি পোশাক সে খুলে নিচ্ছে, লজ্জা ভালবাসা সব একে একে পড়ছে খসে)।

উঠে বিনীতা ততক্ষণে জানালা খুলে দিয়েছে। সারা ঘরে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সানন্দ খানিকটা রোদ, এক দৃষ্টে চেয়ে থাকলে তাদের হাততালিও শোনা যায়, রোদ নয়, অনেকগুলো খুশী, ঝলমল বাচ্চা যেন, একবার এই উপমা তার মনে আসে, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিশ্রী তুলনাও ছবিটাকে ফড়ফড় ছেঁড়ে। বেলা হওয়া, দিনের আলো ফোটা যেন স্ট্রিপ-টীজ-এর মতন, যা-কিছু শালীন, সব খুলে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে একেবারে উদ্‌লা করে দিচ্ছে।

নইলে ফুলদানির ফুলগুলো যে শুকনো, বিনীতার চোখে পড়ত না। রজনীগন্ধার শিটিয়ে আসা ডাঁটাগুলো তুলে সে জানালা দিয়ে গলিয়ে দিল। বালিশটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইস' এরই মধ্যে কী নোংরা। দিন, খুলে দিন, আজই কেচে দেব। 'ভাগ্যিস জামার তলার গেঞ্জিটা বিনীতার চোখে পড়ছিল না।

—দিনরাত বিছানায় পড়ে পড়ে থাকেন, তাই না এত ময়লা হয়! কী করেন, শুয়ে শুয়ে, কী ভাবেন?

—বিনীতা, আমি স্বপ্ন দেখি।

—স্বপ্ন, ও মা! কী স্বপ্ন?

—চমৎকার সব স্বপ্ন। শুনতে তোমারও ভাল লাগবে। ধরো, তোমার বিয়ে হচ্ছে। লাল টুকটুকে চেলি, শানাই—

বিনীতা বলল, যাঃ!

—তা-ছাড়া বিনীতা, আমি অনেক দূরে দূরে চলে যাই। তাই তো ফিরতে দেরি হয়, তাই এত বেলা অবধি ঘুমোই।

বিনীতা বুঝতে পারছিল না, তাকে বোঝানোও যাবে না। কোথায় সে যায়, কত দূরে। যেমন আজই শেষ রাত্রের সেই স্বপ্নটা! কী করে সে বলবে, বিনীতা, আমি চলে গিয়েছিলাম মর্গে। খুব কড়া ওষুধের গন্ধ ছিটানো ঘর, জানো? মাথায় ঝিম ধরে, স্নায়ুগুলো আপনা থেকেই নিস্তেজ হয়ে আসে। হাসপাতালে যে রকম গন্ধ থাকে, তার চেয়েও বেশি, উগ্র অথচ পচা পচা। কতকটা বাসী বিয়ের দিন বরযাত্রীদের সিল্‌কের পানজাবির গন্ধের মতো, আগের রাত্রে যারা আতর মেখে বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল।

কিন্তু ঘরটা খুব ঠাণ্ডা, শীতল, বোধহয় শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত। মনে হয় কোনও সিনেমায় গিয়ে বসে আছি। কিংবা চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীটের কোনও পানশালায়। বিনীতাকে অবশ্য এ সব বলা যাবে না। চাকুরে মেয়ে যদিও, আর

সে যতদূর জানে পোড়-খাওয়া, তবু তো মেয়ে। কোথাও না কোথাও তালশাঁসের মতো কলজে ওর নিশ্চয়ই আছে, শেষ অবধি ওরা প্রাণপণে জমিয়ে রাখে, কৌটোয় টাকার মতো, সহজে বেহাত হতে দেয় না।

কমলা-কোমলা নারীপ্রকৃতিকে এখনও মনে মনে তার প্রাপ্য রাজস্ব দিতে পারছে বলে সে নিজের প্রতি সশ্রদ্ধ হল।

ঠাণ্ডা ঘর, ঠাণ্ডা ঘর এই মর্গ, লাসকাটা কুঠিটা। স্ট্রেচারে-বেডে-টেবিলে মড়ারা ছড়ানো। কোনোটা কাটা-ছেঁড়া, কোনোটা আস্ত, ডাক্তারেরা সবগুলো শবের সমীক্ষা কাল সন্ধ্যায় সারতে পারেননি, তাই দরজায় কুলুপ এঁটে মড়াছড়ানো ঘরটা ছেড়ে গেছেন।

সে বলল, কালকের টোটাল কত?

—টোটাল, কিসের?

সে হাসল।—বাজার খরচের কথা বলছি না। ডেথ্ কত?

—কাগজে তো কুড়ি দিয়েছে। সব নাকি সনাক্ত করা যায়নি। পুলিশ বলছে খুঁজেও পাওয়া যায়নি সব।

বিনীতা চৌকাঠের ওপাশ থেকে কাগজটা নিয়ে এল। হেডলাইনটা চোখে পড়ল তার, কিন্তু সে দেখেও দেখল না, বিতৃষ্ণায় চোখ ফিরিয়ে নিল। হরফ-গুলো বড্ড কালো, যেন আলকাতরা দিয়ে লেপে রেখেছে। ঠিক এই রকমই আলকাতরা মাখিয়ে ওরা অনেক সময় ফেলে রাখে মড়াদের, না? কিংবা ধড় মুণ্ডু আলাদা করে ফেলে দেয় ম্যানহোলে—

বিনীতা অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল "মা গো।" তখন সে পিঠে হাত রাখল বিনীতার। শোকে যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে, আর ভয়ে অভয়, সেই প্রথাসম্মত গলায়। বলল "সবাইকে নয়। ম্যানহোলে সবাইকে ফ্যালে না। কাউকে কাউকে গঙ্গাতেও ভাসিয়ে দেয়। তার মানে বিনীতা, স্রোতে কিংবা ভাঁটার টানে অনেক পুণ্যবান মড়া মোহানায়—এমন-কি সাগরেও হয়তো পৌঁছে যায়। একেবারে অনন্তের অংশ হয়ে গেল, ওদের কী ভাগ্য বলো তো।

স্থির চোখে তাকিয়ে সে হাসছিল।

—তাছাড়া, যারা রাস্তায় পড়ে থাকে, তাদের তো কুড়িয়েও নিয়ে আসা হয়। রোদে-বৃষ্টিতে শহীদের শরীরগুলো ভেবে দ্যাখো কত কষ্ট পেত নইলে। সরকার বাহাদুর খুব সদয়। মর্গে এনে রাখে, সুশীতল আবহাওয়ায় চমৎকার আপ্যায়ন। ভদ্রতা বা কর্তব্য, কেউ ত্রুটি ধরতে পারবে না, কী বলো?

—আমার বমি পাচ্ছে। বিনীতা বলল, ক্লিষ্ট থুতনির কোন্‌টা ঝুলিয়ে দিয়ে সে একটা ঢোঁক দমন করে নিচ্ছিল। তখন সে আবার একটা হাত রাখল বিনীতার পিঠে। বলল, একরকম কানে কানে, 'আগে আমারও পেত। প্রথম যেদিন রাস্তায় একটা ডেড্ বডি দেখি। আর পায় না। আজকাল ইউক্যালি-পটাস তেলে রুমালটা ভিজিয়ে রাখি, আর বাইরে বেরুলে? চোখে কালো চশমাটা তো আছেই। নাক আর দু'দুটো ইন্দ্রিয়ের কাজ ওখানেই খতম, ব্যস। আর

বমি পায় না। তার মানে কি একটু কম মানুষ হয়ে যাচ্ছি? বমি করাটা কি মানবিকতার একটা অর্থ, ধর্ম? কই, কোনও ফিলজফি বা ফিজিওলজিতে এ কথা তো বলে না। তবে?

বিনীতা কাঁপতে কাঁপতে টুলটায় ফের বসে পড়েছিল। আর সে, সেও কাঁপা হাতে খুঁজছিল জামার পকেটে সিগারেটের প্যাকেটটা; কিন্তু পাচ্ছিল না। একটা ঠোঁটে চেপে ধরতেই সেটা ভিজে গেল। পর পর তিনটি কাঠি নিবতে এগিয়ে এল বিনীতাই। দেশলাইয়ের আলো আড়াল করে ধরে বলল, 'আপনিও কম নরম নন।'

—নরম মানে ভীতু বলছ তো? নইলে কি আর বিনীতা তোমার রক্ষিত হয়ে বাস করতাম?

—এ কী কথা বলছেন আপনি? আরো গায়ে যেন কাঁটা দিল বিনীতার। সে চোখ বুজে বলল।

সে বলল, কথাটা খারাপ অর্থে বলিনি। বরং সম্পর্কে হিসেবে এর উল্টোটাই—রক্ষক আর রক্ষিতা—শুনতে খারাপ বেশি।

বিনীতার মুখ ব্লটিং কাগজের মতো শুকনো, বলল এই ব্যবস্থায় সুবিধে বরং আমারও। দাদা যাবার পর থেকে একা হয়ে পড়েছি। একজন পাহারাদার চাই তো মেয়েদের, চাই না? আপনি আছেন, তবু তো একজন পুরুষ।

এতক্ষণে সে হেসে উঠতে পারল।—আসল কথাটা বলেই দিয়েছ তুমি, "তবু" আব 'তো'। ওই দিয়েই আমার এখনকার পুরুষত্ব? পাহারাদার? চমৎকার একজন পেয়েছ বটে। প্রায় সারাক্ষণ যে পালিয়ে থাকে দূরে, ভয়ে জুজু এই মানুষটা, বিনীতা, অবশেষে তোমার পাহারাদার হল? বলো তো মাথায় পাগড়ি আঁটি, আর গালে গালপাট্টা। আর কোনও কাজ তো নেই, খালি আহার, নিদ্রা, আর পাহারা।

—কেন, আপনি তো লিখছেন, লিখতে পারছেন এখানে বসে। বাইরের গোলমাল নেই, অনেকটা দূরে থেকে শান্তিতে—

হাত বাড়িয়ে সে মুখ চাপা দিল বিনীতার।—শান্তি? ওই কথাটা বোলো না। আর লেখা? লিখতেই বা পারছি কই। লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি, মনোমত হয় না। ফের পড়তে গিয়ে দেখি, সব নীরক্ত। আসল কথা কী জানো, একটাও পুরুষ চরিত্র আঁকতে পারছি না আমি, ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। শুধু নারী আর নপুংসক দিয়ে একটা লেখা দাঁড় করানো যায় না বিনীতা, পুরুষ ভূমিকা বিবর্জিত নাটক একদম অপাঠ্য হয়।

বিনীতার কানের কাছে মুখ নিয়ে কথাগুলো সে বলছিল বলে তপ্ত হয়ে উঠছিল বিনীতার গাল, বিনীতা কাঁপা-কাঁপা আঙুলে কয়েকটা চুল সরিয়ে দিল। একটু হাসতেও চেষ্টা করল হয়তো, হাওয়াটাকে হালকা করে দিতে।—ভালোই হল, শাপে বর, আপনার এই বাধ্যতামূলক অবসর, আত্মগোপন যাই বলুন না কেন। যেমন হোক, তবু তো এবার আপনার অনেক লেখা পড়তে পাব?

—কিন্তু সে রকম লেখা আর পাবে না বিনীতা, তোমরা দশজন মেয়ে কখনও চিত কখনও বালিসে বুক চেপে উপুড় হয়ে পড়ে যা গিলতে আর শ্বাস ফেলতে ঘন ঘন। পায়ের তলায় সুড়সুড়ির মতো মজা—আমার লেখায়, আর পাবে না। আমি এবার—সে ঘোষণা করার মতো গলায় বলল,—আমি এবার সময়, আমার সময়কে ধরতে চাইছি, একটু আগে তুমি বলছিলে না, এখানে গোলমাল নেই? নেই বলেই তো মুশকিল, সব গোলমালকেই যে আমি এবারকার লেখায় মিশিয়ে দিতে চাই। বাইরের গোলমাল, যত গোলমাল আমাদের ভিতরকার। এই লেখাটার ভাবছি নাম দেব 'যদিও সন্ধ্যা।'—কেমন নাম? সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া? যাক না। তবুও বলব বিহঙ্গকে, এখনই বন্ধ কোরো না পাখা।

সে হাঁপাচ্ছিল। উত্তেজনায় হাতের জলন্ত সিগারেটটা না নিবিয়েই ঠেসে ধরতে গিয়েছিল ওর কব্জিতে। বিনীতা ছুটে এল।—কী, করছেন কী? আপনি কি পাগল? শক্ত করে বিনীতা চেপে ধরল ওর হাত, ছাড়াতে গিয়ে সেও কখন শক্ত হাতে ধরে ফেলল সেই হাত, তার খেয়াল ছিল না। বিনীতা মাথা নীচু করেছে। বিনীতার উপরের ঠোঁটের কোণে খুব সূক্ষ্ম স্বেদবিন্দু জমেছে। মাথা নীচু করেই বিনীতা বলছে, ছাড়ুন। বেলা হল। আমি এবার যাব।

॥ দুই ॥

কিন্তু না, এসব না, আমি না এখন বাস করি আমার অতীতে আর স্মৃতিতে, আর কখনও আগুনের ফুলকি হয়ে ঝলসে ওঠা, কখনও বরফের ফুল হয়ে ঝরে যাওয়া স্বপ্নে? তবে এ-সব কী। পলাতক, পরাশ্রিত আমি, যার ভবিষ্যৎ নেই, কেন বর্তমানকে ধরতে চাই, লোভীর মতো হাত বাড়িয়ে? কিছু পাব বলে? রসদ সংগ্রহ? পাব, না কষ্ট করব? আমি যা-ই ছুঁই, তাই তো নষ্ট হয়ে যায়। দু'হাতে মুখ ঢেকে সে এই সব ভাবছিল, সে ঘরে বিছানায় অনন্তশয়নে প্রলম্বিত হয়ে, ঘরটা আবার অন্ধকার। সে নিজেই কখন পর্দা টেনে দিয়েছে, এঁটে দিয়েছে দরজায় খিল, তার মনে নেই, তার সব কাজ আজকাল একটা যন্ত্রবৎ, সচেতন বিচার বিবেচনা কিছু নেই।

অথচ চেতনা আছে। সেই চেতনা আছে। সেই চেতনা ফটো তুলে চলেছিল। এই ঘরের, তার শয়ান মূর্তির। ঘরটাই তার একটা মর্গ হয়ে গিয়েছিল, সেই মর্গ আর সে অন্যতম এক শব। ঝিমঝিম গন্ধ, ওষুধের, আরকের। সে যদি শব তবে তার ধড় কই, মুণ্ডু কই? আশে পাশে এরা কারা, যারা হাত-পা নেই-পচা-গলার সমষ্টি? বাইরে রোদ, না রাত্রি? রাত হলে এটা শুক্ল, না কৃষ্ণ, কোন্ তিথি? অথবা এই ঘরে আর শুক্ল কৃষ্ণ বলে কিছু নেই, কাচের শার্সির

বাইরে টপ্ টপ্ মোমগলানো জ্যোৎস্না যদি ঝরতেও দেখি, জানব যে সে দৃষ্টিভ্রম, এখানে এই মৃত্যুর মহাতীর্থে আছে শুধু পক্ষ-নিরপেক্ষ সময়? প্রত্যেকেই যেন নগ্ন, কেননা এই স্থান জাগতিক-লজ্জাতিরোহিত, আর আশ্চর্য, প্রত্যেকের মুখ পীত। মৃত্যুতে সব বর্ণ, সবাকার বর্ণই কি পীত হয়ে যায়? মৃত্যুর রক্ত কালো কে বলেছে! মৃত্যু হলুদে, সে এই প্রথম জানল।

কিন্তু ওরা কারা? এই লাসকাটা ঘরে আরও কতজনকে ফেলে রেখে সবাই চলে গেছে? পলাতক, সব পলাতক—সারা পৃথিবীটাই পলাতক। একটু ইচ্ছে হচ্ছে ওদের সঙ্গে কথা বলি, আমিও যেহেতু ওদের সগোত্র, আমিও এখন শব। সটান শুয়ে পড়ে ওদের পাশে সে এইসব ভাবছে, আর শিহরিত হয়ে তখনই—আরে, আমার মুণ্ডুটা শরীরের সঙ্গে জোড়া নেই কেন। এটাকে কি ওরা পাশের টেবিলে রেখে গেছে—ভুলে? নাকি মাথাটা গড়িয়ে টেবিলের তলায় পড়ে গেছে, ইঁদুরেরা এখন কুটকুট দাঁতে কুরে কুরে খাচ্ছে? পারলে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে মাথাটা তুলে ফেলি, লোকে টুপি যে রকম করে পরে, সেই কায়দায় পরি। ঠিক এঁটে যাবে।

তা হলে সাধ মিটিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করা যেত, ওরা, যারা এখানে আছে। কিন্তু হাত বাড়াতে পারছি কই। তবে কি এখানেও আমি একা। একা একাই কথা বলতে হবে নাকি যেমন ইদানীং প্রায়শ বলি, আমাকে আমি?

জেনে নিতে পারছি না, জিজ্ঞেস করা যাচ্ছে না "তুমি কে, তুমি কে, তুমি কে।" জানলেই বা কী হত, ওরাও আর কিছু নেই তো। কেউ নয়, আজ আমরা সবাই "নেই" হয়ে গিয়েছি।

বুঝতেই পারছি এই সব, যখন হঠাৎ-হঠাৎ হাওয়া উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে, আর হলদে একটা আলোয় ভিজে ওই গাছটা, কী নাম যেন, একেবারে ন্যাতা হয়ে আছে। গা তেলতেলে আর মাথা ন্যাড়া; ওর মনে এখন খুব মমতা, ওই গাছটার। বুঝতে পারছি, দেখতে পাচ্ছি। অথচ এখন আমার মাথা আলাদা, ছিন্ন এবং ভিন্ন হয়ে, দূরে। তবে বুঝছি কী করে, দেখছিই বা কী প্রকারে? বোধ হয় বোধ দিয়ে। স্নায়ু শিরা সমেত আমার অস্তিত্বের অনুকম্পায়ী সমস্ত। চোখ সেই সুযোগে শরীরের যত রোমকূপ সব সহর্ষে দেখে নিচ্ছে, এই মুহূর্তে আমি সহস্র-চক্ষুষ্মাণ ইন্দ্রপ্রতিম।

আমি অপিচ এক্ষণে সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ। ভাবছি, মানে জাল ছড়াচ্ছি, আমাকে নিয়ে। বলে যাচ্ছি আমি আমাকে, চিৎ হয়ে শুয়ে। সেটা অবশ্য নতুন নয়। এই অভ্যাসটা জীবিত দশার শেষ ভাগেই রপ্ত হয়ে যায়, আপনা থেকেই। আগে, যৌবনকালে যখনই একা, দুঃখ ব্যথা ইত্যাদিতে কাতর, তখন কিন্তু শুয়ে পড়তাম উপুড় হয়ে, বুকে বালিশ-টালিশ চেপে। দুঃখটাকে তাতেই ভীষণ সুখের মতো লাগত।

কিন্তু হঠাৎ একদিন টের পাই, ইদানীং আমি আর উপুড় হয়ে শুই না, চিৎ হয়ে সটান থাকি, চোখ বুজে। তাতেই বেশ সময় কাটে। ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করেছি বালিসের প্রয়োজনকে।

এখন তো আমি আর পাশ ফিরতেও পারব না, যেহেতু মৃত। কতকটা এক নীতিতেই নিষ্ঠ থাকা যাকে বলে। জীবনে যা পারিনি। এখন পারব, চিৎপাত থাকা এক ভাবে। যদি না, যতক্ষণ না, কেউ পাশ ফিরিয়ে দিচ্ছে।

ততক্ষণ সাধ মিটিয়ে কথা বলে নিই, নিজের সঙ্গে। কতদিন যে বলতে পারিনি। সুদে আসলে সব পুষিয়ে নেব, এই পারে। বেশ কিছুকাল যা ভাবতাম তা বলতাম না (বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না, কিশোরী মেয়েদের রকম সকমে এই বুড়ো মিনসেটা চলে গিয়েছিল আর কী), যা বলতাম তা লিখতে সাহস হত না, এধরনের চাপাচাপি চলছিল। আজ সব খুলে গেল।

আমি এখানে কী করে এলাম। এলামই বা কেন?

এই যে দু'টি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলাম, যেন কোলে তুলে নিয়েছি সেতার সাধব বলে; ঘাটটাট বেঁধে নিয়েছি, তারপর, কিন্তু কথা হল, আমি কে?

জব্বর জিজ্ঞাসা, কড়া একখানা ছেড়েছি বটে, আস্ত থান ইট। কপালে লাগলে ফাটত, কিন্তু লাগল গিয়ে বুকে, ঠিক যেখানটায় কল্জে। সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাত হয়ে গেল। আমি কে, আমরা কেউ কি তা জানি। নাম জানি, ধাম জানি। নামটা সচরাচর রাখা হয়ে থাকে অন্যের দ্বারা। পেশা, কুল-পরিচয় এই সবও জানি। আর কিছু না। আমরা করতে পারব কী, বড় জোর চিরে-ছিঁড়ে দেখতে পারি। কসাইরা যেমন জবাই করে ছাড়ায়, ঝুলিয়ে দেয় আংটায় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু হায়, মুণ্ডুকাটা পাঁঠা-খাসি তখন নিজেদের দেখতে পায় না! কিন্তু আমি পারব, যেহেতু এক্ষেত্রে আমিই কসাই, আমিই খাসি। অধিকন্তু আমার আছে বিধিদত্ত একটা ক্ষমতা, কিছুদিন হল টের পেয়েছি—স্বগত সংলাপের। একা একা কথা বলার অভ্যেসটা ছেলেবেলা থেকেই। তখন ব্যাপারটা কারও সামনে ধরা পড়ে গেলেই সে মাথায় চাঁটা মেরে বলত, এই, একা একা খবরদার কথা বলতে নেই, পাগল হয়ে যায়। সে ভয়টার পরোয়া তখন করিনি, এখন তো ভয় একেবারেই ঘুচে গেল। মর্গেই যখন পৌঁচেছি, তখন কি আর পাগলা গারদে কেউ পুরবে? এ-যাত্রা এই শেষ। মড়াকাটা ঘরে পৌঁছনো মানে গারদের প্রতিষেধক টীকা নেওয়া হয়ে গেল।

আমি কে? মনে পড়ছে একটু-একটু, কুয়াশার ফাঁকে ঝাপসা গাছপালার একটু-একটু ফুটে ওঠার মতন। আমি একজন লেখক, মানে লিখে-টিখে থাকি। লিখি যদি, তবে পালিয়ে আছি কেন? তাও মনে পড়ছে। আগে আমি মানুষকে চিনতাম, তাদের মধ্যেই থাকতাম, লিখতামও তাদের নিয়ে। কিন্তু পরে সেই মানুষেরাই আমাকে ছেড়ে গেল, কিবা পুরুষ কিংবা নারী আমাকে দেখলেই

তাদের চোখে মুখে কেমন দূর-দূর ভাব। কাছে গেলে গুটিয়ে যায়, মুখ শিটিয়ে থাকে। আমি কি ক্রমশ ডাল্, আন-ইন্টারেস্টিং একটা পদার্থে পরিণত হচ্ছি নাকি, নইলে আমার আকর্ষণ কমে গেল কেন? অথবা শুধুই সফল একটা প্রাণী, চকচকে সচল, একটা রৌপ্য মুদ্রা বৈ কিছু না, তাই ঈর্ষাতুর সকলে? অথবা কারও কারও চোখে আমি কেবলই একটা উদ্দেশ্য সিধির মাধ্যম মাত্র, আমার আর সব সত্তা খুইয়েছি? তা-ই যদি হয় তবে আমিই বা থাকব কেন লোকালয়ে? মানুষেরা যেহেতু ছেড়ে গেল, যেতে থাকল, আমারই দোষে বা কপালদোষে, তাই আমিও হাড়লাম মানুষকে। তাদের, যাদের সঙ্গে যন্ত্রণায়, ভোগে, সুখে শোকে মাখামাখি হয়ে থেকেছি। অবশ্য মানুষ ছেড়ে পোষা যেত কুকুর, বিকল্প কোনও প্রাণী, কিন্তু আমার রুচিতে তা মেলেনি। চলে যেতে পারতাম প্রকৃতিতে, সময় বেশ কাটতে পারত পরিচর্যা করে মৌসুমী কুসুম, সুললিত লতা ইত্যাদির, কিন্তু আমার সে ধৈর্য ছিল না। বিমুখ আমি তাই খুঁজে নিয়েছিলাম নিজেকেই! খুঁড়ে খুঁড়ে তাকে বের করলাম, চকচকে করে তুললাম মেজে ঘেষে। আমার যত বিফল বাসনা বহাল হল আমারই খিদমতগারিতে; দিব্যি।

আর, আর কে? উড়ে এসে জুড়ে বসল আর যে, তার নাম কী? যেদিন যেদিনই বর্ষা নামত মাঝরাতে সেদিনই কোথাও বজ্রপাত হত, হয়তো আমার হৃদয়ে, আমি জলদমন্দ্রস্বর শুনতে পেতাম। কার? আমার স্বত্বাধিকারীর? (আমার স্বত্বের অধিকারী। নিশ্চয় কেউ কোথায় আছে) সে হুকুম দিত। আমাকে।

অধিকারী কে, আমার বিবেক? (এইবার সে একটা ধ্বন্যাত্মক অশ্লীল অব্যয় উচ্চারণ করল) বিবেক, মাই শিট্! জ্যান্ত মন যদি মরে, তবেই না মরে বিবেক হয়? বুকের পাঁজরার হলঘরে, অথবা অনুভূতির কোনও ফাঁকা করিডরে, সমারোহে সাদরে সে টাঙানো থাকে, জীবাশ্ম-কঙ্কাল ইত্যাদি। যেমন জাদুঘরে দেখেছি।

অন্ধকারে বোবা বোধও ফসফরাসের মতো জ্বলে। সেই বোধটাকে সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছিল ঘরের সমস্তটা, ঘর মানে সেই মর্গ, যেখানে, তার ধারণা, সে এসেছে। মাঝে মাঝে এক-একটা অবয়বের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। জেনে নিতে হবে কে-কে এখানে, এবং কেন।

ওই মর্গে একটি রমণী মূর্তির সঙ্গে তার কথা হল প্রথমত। তার একটু বিস্ময় জেগেছিল। তাকে এক দিন এক মাঝ রাত্তিরে ঘর থেকে যে বের করে দেয়, সেই মেয়েটা না? হ্যাঁ, এ সেই তো।

আজ আর কোনও বাধা নেই, সুতরাং সে সোজা মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল—তুমি এলাচ না?

চোখ-কটা শিরা-ওঠা মেয়েটা যেন চমকে উঠল। বলল, হ্যাঁ, আমিই এলাচ। কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারছিনি বাবু, আপনি?

—আমার কথা থাক। কিংবা পরে আসছে। কিন্তু তুমি এখানে?

—মরিচি যে!

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তোমার তো স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি এলাচ, নইলে এখানে এলে কেন।

—না বাবু, স্বাভাবিক মিত্যু হয়নি আমার, মানে রোগে ভুগে মরিনি। আমাকে মেরেচে।

কে?

—আমার ঘরে কাল যে এসেছিল, সে। গয়নার লোভে। এলাচের কটা চোখের মণি একবার দপ্ করে উঠল, বলতে বলতে।

—বলো কী? সে যেন অবাক হল, খুব একটা অবিশ্বাস্য কথা শুনে।—আজ কালও এই ধরনের খুন হয় নাকি? এখন তো শুনি, যত খুন সব পলিটিক্যাল, পার্টিতে-পার্টিতে, ক্লাসে ক্লাসে ক্ল্যাশ্।

—আমরা বুঝি একটা কেলাস নই, এলাচ বলল ভুরু নাচাবার ভঙ্গি করে।

ভুরু নেই, আঁকা ছিল তো, মুছে গেছে।

—আমরাও তো কোনও একটা কেলাসে পড়ি বাবু, বলুন না কোন্ কেলাসে? এলাচ বলছিল চ্যালেন্জের ঢঙয়ে, জবাব দিচ্ছিল নিজেই।—আমরা বোধহয় পড়ি পেট চালাবার কেলাসে। পেটের জন্যে যারা সব করি, সব দিই—আমরা; আগেই মরে থাকি—পেটের জন্যে। পরে যে মরিচি; তার কারণও ওই—পেট।

ব্যথিত গলায় সে বলল, তোমার মনে আছে এলাচ, একদিন তুমি আমাকে তোমার ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলে?

এলাচ মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, মনে নেই। কত লোক আসত যেত! তাছাড়া তোমরাই তো বলো আমাদের নাকি মনই নেই। হিসেব টুকে রাখব কোত্থেকে?

॥ তিন ॥

কিন্তু তার মনে ছিল। মনে পড়েছিল।

"কত?" সে জিজ্ঞাসা করেছিল, চৌকাঠে পা রেখেই, যেহেতু চৌকাঠ সে চট করে পেরোয় না, কেন যে! ওটা তার স্বভাবও না, বরং বলা যায়, না-পেরোনোটাই তার চরিত্রের অন্তর্গত, সৎ চরিত্রের।

মেন লাইন ছেড়ে সাইডে এসে তার বিষয়ে এই কথাটা লিখতেই হল, একটা দেশালাই জ্বালিয়ে তার অন্ধকার দিকটা দেখিয়ে দিতে। ওটা দরকার, এই লেখাটা পড়তে।

সে নিজেও তাই ভাবছিল। আমি আসলে আজকাল কাউকে দেখছি না,

তো, ঘুরে ফিরে দেখাচ্ছি নিজেকে। ফিরে ফিরে আসছি। না, প্রীতীন, নিশীথ, কুন্তী, অশেষ, নীলা, তোমাদের কথা আমি আর লিখি না। তোমাদের কথা বলতে তোমরাই তো আছ, যারা টকটকে তরমুজ ফালি ফালি ভাগা দিয়ে বসেছ, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে, বসছে মাছিও, সেই মাছিসুদ্ধ টাটকা রক্ত। কিন্তু তোমাদের বাজারে আর বসব না আমি। আজকাল আমাকেই বিছিয়ে বসছি, বারে বারে। তোমাদের কথা লেখার জন্যে তোমরাই আছ, ধূসর বিষণ্নতা, বিচ্ছিন্নতা, যুগযন্ত্রণা, বিপ্লব না আরো কী-কী সব, তোমাদের কথা লিখতে আরও অনেকে শিং ভেঙে বাছুর হতে মুখিয়ে আছে। কিন্তু আমাদের কথা লেখার কেউ তো নেই, আমাদের কথা শুনবে এমন লোক বিশেষ অবশিষ্ট নেই, অগত্যা তাই নিজেদের কথা নিজেরাই চিৎকার করে জানানো। অপুত্রক কেউ কেউ যেমন নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করে রাখে, কতকটা সেইরূপ। নিজ হাতে নিজ প্রেতকে পিন্ডদান কিঞ্চিৎ দুঃখজনক বৈকি, যেন ব্যাকরণের নিজন্ত প্রকরণ, কিন্তু উপায়ই বা কী? যা দিনকাল, কবে টেঁসে যাই ঠিক নেই।

যাক গে, সে যা ভাবছিল, এলাচের মুখোমুখি হয়ে সেই ভাবনাতেই ফিরে গেল। সেই রাত্তিরে যখন ভারী মজার ব্যাপার আর আলাপ হচ্ছিল।

তার স্বগত : 'কত'? চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করেছি 'কত'. মেয়েটার উত্তরটা ছিল মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত। পুট করে বুকের লকেটটা খুলে সে দেখিয়েছিল। "স্ট্যানডার্ড প্রাইস। সব এই মেনুতে লেখা আছে।"

মেনু? লকেটের মধ্যে মেনু? হকচকিয়ে গেলাম। তার লকেট দেখলাম. বুক দেখলাম! অ্যাডভান্স, ফাউস্বরূপ। চীনে বাজারে কেনা দুটো সাদা কাপমাত্র, ভিতরে কী পদার্থ আছে জানি না। ও কোন্ বাজার থেকে কিনেছে, তাও না। এখানেই বানায়, শিকেয় টাঙায়, তা-ও হতে পারে, যাকগে।

বললাম, মেনু তো থাকে রেস্তোরাঁয়, আইটেম-বাই-আইটেম ছাপানো।

মেয়েটা বলল, আইটেম-বাই-আইটেম এখানেও। কী চান বাবু, কী খাবেন? অবিকল চায়ের দোকানের বয়দের গলা নকল করে বলল। চপ খাবেন, না কাটলেট? রোস্ট? হাড় চিবুতে পারবেন? দেখি, আপনার দাঁত দেখি?

দেখালাম। মানে দাঁত বের করেই তাকে বললাম "আমার কাছে রেস্ত কিন্তু বেশি নেই।" মানিব্যাগটাও খুলে দেখাতে যাচ্ছিলাম, সে চিবুকে রাখা আঙুলটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে বলল,

—খোলাখুলি-টুলি, ওসব পরে।

—তাই তো আগেই জানতে চাইছিলাম, কত। ছাত্র তো নই যে কনসেশন চাইব!

—এখানে দরেরও তো দস্তুর নেই। তবু যাই, মাসীকে একবার শুধিয়ে আসি। বলেই সে তরতর কাঠবিড়ালির মতো ওপরে ছুটল।

আমি চুরুট ধরালাম। আগে, কমবয়সে সিগারেট টানতাম, এখন চুরুট খাই। মাথা ঘুরছিল, আর একটু বাড়তি মাথা ঘোরা দিয়ে আগেকার ঘোরাটাকে লড়িয়ে দেওয়ার দরকার ছিল।

যেন গেল আর এল, ওই মেয়েটি। এসেই হাতের আঙুলগুলো তুলে কত দর তা দেখিয়ে দিল। কত? ঠিক ধরতে পারলাম না। প্রথমত মেয়েটা হাতের সবগুলো আঙুল দেখিয়েছিল কিনা বুঝতে পারিনি। দু'একটা ভাঁজ করেও রেখে থাকতে পারে, ইকড়ি-মিকড়ি খেলার স্টাইলে? তা-হলে? দশ হবে না, সাত কি আট। আর যদি পায়ের বুড়ো আঙুলটা নাচিয়ে মেয়েটা সবগুলোই ইসারায় বুঝিয়ে দিয়ে থাকে, তবে তো, 'গুড্ হেভন্স'—পুরোপুরি কুড়ি, যদি অবিশ্যি ওর হাত-পায়ের সব কটা আঙুল থেকে থাকে। আমি অতো শুনতে পারিনি। আমার বন্ধু চাকলাদার হলে পারত, অঙ্কে ওর মাথা খুব সাফ।

এলাচ আমাকে খুব খাতির করে বসাল। টেনে টেনে জোগাড় করল গোটা তিন-চার বালিশ আর তাকিয়া, একটার উপরে আর-একটা সাজিয়ে দিয়ে বলল "বেশ, বাবু হয়ে বোসো তো। বাঃ, এই তো দিব্যি। তোমাকে বাবু-বাবু দেখায়—সত্যি!"

"বাবু-বাবু মানে কী?"

"মানে এই যে টেরিকাটা, জামায় নক্‌শা-করা, হাতায় গিলে, কোঁচানো ধুতি—এ-সব যারা পরে আমরা তাদের বাবু বলি।"

"ওঃ," বললাম, "কী করব, আমরা সেকেলে যে।"

"সেকাল থেকে একেবারে একালে চলে এলে?" মুচকি হেসে এলাচ বলল, খাটে পা ঝুলিয়ে বসল পরিপাটি হয়ে।

"একালে? আসতে আর পারলাম কই। ঘা মারছি সেই কখন থেকে। দোরে দোরে। এই দরজাটাই যা খুলল।"

"আমাদের দরজা খোলাই থাকে।"

এলাচ বসল খুব উদার-উদাসী সুরে, গলাটা খোনা করে একটা ঢং-ও আনতে চাইছিল। হঠাৎ মনে হল সে ঘরের অন্য দিকে চলে গেছে, ও দিকের দেওয়ালে। "কই, কোথায় গেলে।"

"যাইনি তো,: এলাচ বলে উঠল, "এই তো পাশেই আছি।"

তখন বুঝতে পারলাম, ওকে দেখছিলাম উলটো দিকের আয়নায়। সে আমাকে ঠেলে দিয়ে বলল "ও হরি, তুমি আমার ছায়া দেখছিলে? কেমনধারা লোক গা তুমি? কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা ছায়া তাও ধরতে পার না?"

"ফসকে যায়," জবাব দিলাম সঙ্গে সঙ্গে, "কোথাও কিছু ধরতে পারলে আর কথা ছিল কি?"

এলাচ একটা হাতে গাল রেখে মাথা হেলিয়ে, আর একটা হাতের আঙুল ঠেকিয়ে দিল আমার থুতনিতে।—"বাঃ, মুখখানা গণেশের মতো হলে কী

হবে, কথায় তো দিব্যি।"

গণেশের সঙ্গে তুলনাটা ঠিক যেন নাকের উপরে ইঁটের মতো ঠুক্কস করে পড়ল। আমি কি অতোই তেলকুচকুচে, আমার শুঁড় আছে নাকি? হাঁড়ি-হাঁড়ি গলায় বললাম "আমাকে আমি নিজে বানাইনি।"

"আমাকেও আমি না। আমাকে জমমো দিয়েছে একটা মা, তারপর তৈরী করেছে তিন-তিনটে মাসি। ওসব কথা যাক গে। বলো তো আমাকে দেখাচ্ছে কেমন?"

"আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও, তা-হলে বলব।"

"কেন, এমনিতে আমাকে বুঝি দেখতে পাচ্ছ না? তুমি কেমন!" এলাচ আমার বুকের ঠিক মধ্যিখানে তর্জনীটা রেখে আলগোছে একটা ঠেলা দিল।

আয়নার সামনে দাঁড়ালে তার পিছনটাও দেখতে পাব, এই কথাই মুখে এসেছিল, কিন্তু আমার রুচির বিষয়ে ওকে এখনই এতটা কনফিডেন্সে নেওয়া ঠিক হবে না, সময়ের একটা পরমাণুভাগের মধ্যেই সিদ্ধান্তটা আমি নিয়ে ফেলি! আসলে রুচি নয়, ওটা আমার একটা ধারণা, অনেক কাল ধরে জ্বাল দেওয়ার ফলে ধারণাটা রীতিমত ঘন। সেটা এই যে, মেয়েদের সামনে থেকে বোঝা যায় না। একে তো সদরটা নানা কায়দায় কেয়ারিকরা, মুখ-টুখ লেপা মোছা, তদুপরি জমিটা চোখ দিয়ে চষার পক্ষে অনুপযোগী, কারণ, কত টেরাস্ বাপ্‌রে, অত্যধিক থাক-থাক কাটা, এবড়ো-খেবড়ো! তার তুলনায় পিঠ, মানে খিড়কির দিকটা, অনেকটাই সরলতা মাখানো। ফিনফিনে জামা, তার তলায় ভূগোলের দ্রাঘিমার মতো ফিতে আঁকা, চান্স পেলেই আমি তাই পিছন থেকে মেয়েদের দেখি, নজরকে এক্স-রে'র যন্ত্রপাতি করে। একে সুখ বলতে চান বলুন, ভীমরতি বললেও চটে যাব না।

এলাচ যখন বলল 'তুমি ক্যামোন্!" আমি তখন জবাব না দিয়ে চোখ চাল্‌শের চশমা এঁটে তাকে দেখতে থাকলুম। ফটো তোলা হয়নি, হলে দেখা যেত আধবুড়ো এই আমিটা প্রকান্ড একটা কাঠঠোকরা পাখি, মেয়েটাকে চোখ দিয়ে ঠুকরে ঘা করে দিচ্ছি।

সে-সব মেয়েটা যেন গায়েই মাখছে না; যেন একটা ফড়ফড়-পাখা ফড়িং, এই উড়ছে, এই বসছে, এই দুটো খালি গেলাস নিয়ে আমার সামনে ঠকাস করে রাখছে, ভুরু নাচিয়ে বলছে "আর কী চাই, বলো? গান? গাইতে পারি। নাচতে কিন্তু পারব না বাপু, যা ধপাস ধপাস শব্দ হয় মেঝেয়। আর?"

চোখে আমার তখন তৃষ্ণার চেয়ে মৌজ বেশি, ঘোর লেগেছে, মনে হচ্ছে আমি আর আমি নেই, কখনও ছিলাম কিনা জানি না তবে তখন তো নেই, আমি আসলে একটা সর্বাঙ্গে কাঁটা ন্যাড়া কুলগাছ, ক্রমাগত ঝাঁকুনি খাচ্ছি আর শুনছি "আর কী চাই, আর? আর?" জ্যৈষ্ঠমাস, গলির গলি তস্য গলির একটা খুপরি ঘর কিন্তু হাওয়াটা হিল-ইসটেশনের মতো হঠাৎ হিম হয়ে গেল, ঘুলঘুলি দিয়ে ফগ ঢুকেছে, ভিজে ধোঁয়ায় সব ভিজে ফাঁপা করে দিচ্ছে, "আর?

আর?" ওর সেই জেরার আমি জুৎসই জবাব দেব কী? তোৎলা গলায় বললাম "বসতে চাই।"

"বসতে, শুধু বসতে?" দেখতে দেখতে ওর শরীর ধনুকের মতো বেঁকে বৃত্তচাপ হয়ে গেল, মেয়েটা একটু দূরে সরে গিয়ে আমাকে এক দৃষ্টে দেখতে লাগল। ওর বুকের কাপড় এই শরতের মেঘ হয়ে উড়ে যাচ্ছে, এই ওরা ভাদরের ঢল হয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ছে।

তার পরই দমকা বাতাসের মতো সে যেন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কানে গলায় নাক ঘষে ঘষে বলতে থাকল 'বসতে, শুধু বসতে?" মেয়েটা বাংলা প্রবাদকে অবশ্যই বেদবাক্য জ্ঞান করে, শুতেও চাই কি না সেইটেই ঘষে ঘষে পরখ করে নিতে চাইছে?

আমিও তখন জয়-মা বলে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। ব্যাপারটা যেন একটা বানভাসি, এই রকম আন্দাজ করে হাতড়ে হাতড়ে কলাগাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরার মতন। নাকে সুড়সুড়ির ভ্রূণ তখন হাঁচি হয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ার লক্ষণ দেখাচ্ছে। এক্ষুনি ঘটলে সেটা অকাল প্রসবের তুল্য হবে বিবেচনা করে আমি যথাসম্ভব গর্ভধারণের মতো সাবধানে বললাম "তোমার গায়ে অদ্ভুত একটা গন্ধ।"

কী রকম গলায় বলেছিলাম মনে নেই, গভীর, মদির, এই রকম একটা কিছু হবে।

"গন্ধ, কিসের গন্ধ?" এলাচ সন্দিগ্ধ হয়ে হাতের তেলো নাকের কাছে এনে শুঁকল।—"ওঃ। বোধহয় গঙ্গাজলের। আমি যে নিত্যি মাসির সঙ্গে গঙ্গা-চ্চানে যাই। বলেই সে হাসল, হাসিতে সারা ঘরে পুণ্য ছড়িয়ে পড়ল। মাথা হেঁট করে অতঃপর সেই বালিকা গেলাসে পুণ্যিপুকুরে জল ঢালার মত করে মদ ঢালল।: সে গন্ধও দিব্য, স্বর্গীয়।

তাড়াতাড়ি দু'হাতের নির্লোভ পাতা ছড়িয়ে সবিনয়ে বললাম "আর দিও না, আর না।"

"তুমি নেশা চাও না?"

তুমিই তো নেশা, তোমাকেই তো চাইছি, কথার পিঠে এই কথাটাকে রেকাবে-বসা সওয়ার করে দেওয়া যেত, কিন্তু পুণ্যবতীকে এইসব নীচু ক্লাশের বুলি ঝাড়া উচিত হবে না। সে সপাং করে বিনুনিটা আমার গালে মেরে বলল "তুমি যে দেখছি কিছুই চাও না। তুমি কে বলো তো? কেন এসেছ? এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

এতদিন কোথায় ছিলেন, কবে শুনেছিল সেই একজন, তারপর আমি এই দ্বিতীয় জন। কোথায় ছিলাম, তাই তো কোথায়। আমি কে? সুপারির মতো শক্ত সব প্রশ্ন।

এই বনলতা সেনটি দৈবে কোনও পেপার সেটার হননি, হলে সব ছেলেকে ফেল করাতেন, ধ্রুব। অন্তত মডারেটর লাগত আধ ডজন। নকল করেও কূল মিলত না, কারণ এ-সব প্রশ্নের কোনোও মেড-ইজি উত্তর নেই।

উত্তর এড়িয়ে তাই বললাম "তোমার গন্ধ খুব নিবিড়," পুরনো কথার খেই ধরতে, কাটা ঘুড়ির সুতোর পিছুপিছু দৌড়তে দৌড়তে। "নিবিড়," একেবারে গীতবিতান থেকে গ্র্যাফট-করা বাংলা, মেয়েটা অবশ্যই বুঝল না, তবে খুব ঢলঢল ফুলের মত আগল-খোলা হয়ে গিয়ে বলল, "সেটা মন্দ, না ভালো?"

বললাম "ভালো।" সেই মেয়ে আরও দুলে দুলে অসম্ভব খুশিতে আরও বেশি ফুল হয়ে গেল। না, না, মৌমাছি। গুণগুণ করে তার জানা যত কাহিনী সুর আমার শ্রুতির পাত্রে ঢালছিল। টইটম্বুর হয়ে গিয়ে একটা অসমসাহসিক কাজ করে বসলাম। ওর নাকের ডগা টিপে তেল তেলে একটু ঘাম বের করে নিয়ে বললাম "তোমার ছোট্ট এই নাকটুকু আর তুলতুলে এই ঠোঁট—খুব সুন্দর। সিনেমা পত্রিকার ভাষায় যাকে বলে সাড়া জাগানো গল্প। নাকটা ঠিক ক্লিওপেট্রার মতো—"

"সে আবার কে?" ঈর্ষাতুর সুরে মেয়েটি বলল।

"ডাকসাঁইটে এক সুন্দরী।"

'তুমি দেখেছ?'

"না।"

"কেউ দেখেছে?"

স্বীকার করতেই হল "কেউ না। এখন যারা বেঁচে আছে তাদের কেউ দেখেছে বলে মনে তো হয় না। যদিও কেউ কেউ ফালতু ক্লেম করতে পারে। এমন-কি হাজার দু' হাজার বছরের মধ্যেও লোকে দ্যাখেনি, শুধু শুনেছে।"

"ও, শোনা কথা!" এলাচ যেন নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানার উপরে ছাতার মতো খুলে গিয়ে ছড়িয়ে বসল। ইতিহাস ছেড়ে আমি তখন পুরাণে প্রবেশ করেছি। স্যাফোর নাম বলব, না আফ্রোদিতির? মেনকা, রম্ভা, না উর্বশীর? মেনকা শুনে সে বলল "জানি। ও-নামটা তো আমার মাসির।"

হাঁফ ছেড়ে বললাম "তবে তো আর কথাই নেই।"

"কথা আমার আছে", সে সটান সোজা হয়ে বসল "এসব কথা বলছ কেন। কে তুমি?"

ফিরে আবার সেই প্রশ্ন। কে তুমি, কে তুমি? মেয়েটা কি আমার জন্মের ব্যাপারে কোনও সন্দেহ করছে?

বললাম "বললে দোষ কী?"

"দোষ নেই, তবে এ-সব কথা যারা বলে, তারা আসলে ঠক হয়। একজন সারারাত ধরে খুব বড় বড় বুকনি, ইংরাজি পদ্য, সমোস্‌কৃতে ভাবের কথা শুনিয়েছিল। তখনই আমার সন্দ হয়। লোকটা ঘুমিয়ে পড়তেই ওর জামার পকেট হাতড়ে দেখলুম ঢুঁ-ঢুঁ, কিস্‌সু নেই।"

"কী হল তার।"

"কী আর হবে। ঠেলে ঠেলে জাগিয়ে দিলুম। উঠতে কি চায়? সেদিন আবার বেজায় বিষ্টি, তায় শীতকাল।"

ঘুমন্ত মানুষকে ঠেলে জাগানোই বেশ নিষ্ঠুরতা, কিন্তু আমার সন্দেহ হল, তার চেয়েও মেয়েটা সেদিন নিষ্ঠুর কোনও কীর্তি করেছে। বললাম "বের করে দিলে?"

"একেবারে বাড়ির বাইরে কি আর? কনকনে হাওয়া, হিম পড়ছে, আমাদের মায়া দয়া নেই? সিঁড়ির মুখে বসিয়ে দিয়ে বললুম, 'এখানে থাকো।' ভোরে বেরিয়ে এসে দেখি তার আগেই সরে পড়েছে। ভালোই হয়েছে। মাসির চোখে পড়লে মাসি ওকে ঠিক পুলিশে দিত। পুলিশের সঙ্গে মাসির আবার খুব জানা-শোনা। এক বড়বাবু এককালে ওর বাবুও ছিল।"

"থাকবেই তো। যিনি বড়বাবু তিনি সকলেরই বাবু। যেমন যিনি বমভোলা-নাথ, তিনি দুনিয়াসুদ্ধ সকলেরই বাবা, যিনি আদ্যা-শক্তি তিনি সকলেরই মা—"

আমার মশকরা থামিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে সে বলল "ঠাকুর দেবতা নিয়ে ঠাট্টা করো না।"

ভক্তিমতীকে অতএব আমি আর আঘাত দিলুম না। সে সরে এসে বসেছে, আমার পানজাবির বুকের বোতাম একটার পর একটা খুলে ভিতরের গেঞ্জিটা কাচা কিনা ছেঁড়া কিনা, এই সবই যাচাই করে নিচ্ছে, এই খানাতল্লাসির সময় নীরব সমর্থনই শ্রেয়। শরীরটা নিজের নয়, এই প্রত্যয়টা এনে ফেলতে পারলে তো আর কথাই নেই। বুকের যতটা খালি ততটাই ওর মাথা দিয়ে ঢেকে সে বলল 'হ্যাঁগা, সত্যি করে বলো, তুমিও পুলিস-টুলিস নও তো? মানে টিকটিকি?"

"হলে ক্ষতি কী?"

"ক্ষতি নেই, এমনি বলছি। ও আবার পছন্দ করে না কি না।"

ও যে কে, জিজ্ঞাসা করতে হল না, সে নিজেই বলল।—"মানে আমি হপ্তায় যার কাছে তিনদিন বাঁধা, সে। ওর মস্তবড় গোলদারি দোকান—মশলার। পই পই বলে দিয়েছে ঘরে আর যাকে আনিস আর না আনিস—কিন্তু খপর্দার! পুলিশ কক্‌খনো ঢোকাবিনে।"

"ওর বুঝি খুব ঝাঁঝ?"

মেয়েটা মানে বুঝল না।

বললাম "মানে, লঙ্কার, পেঁয়াজের, আদার? মশলার দোকান বললে কিনা"।

হেসে সে বলল "মেজাজের।"

"পুলিসের ওপর তবে এত রাগ কেন? উনি কি একজন খুনী?" গলা খাঁকারি দিয়ে যথাসম্ভব সম্মানপুরঃসর বললাম।

মেয়েটি বলল, "আরে, না না। বরঞ্চ খুব ধর্মজ্ঞানী। ওনার বউকে, শালীকে, শালাজকে, পরিবারসুদ্ধ সবাইকে তিন-তিনবার তীর্থে চান করিয়ে এনেছেন, দূর দূর দেশে গিয়ে। হরিদ্বার একবার, একবার নাকি দ্বারকা না কোথায়, আর একবার পুষ্করে। কোনও কর্তব্যে ওনার ভুল হয় না। অধর্মো বলে কিছু নেই।

"তবে যে পুলিসে—"

"বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা যে। পুলিশ খুনীর খোঁজে আসে। আজকাল আবার পুলিশের পিছু পিছুও তাড়া করে আসে নানা রকম খুনে। তুমি বাপু আজকালকার বিত্তান্ত কিছুই জানো না।

অভিজ্ঞতায় জ্ঞানে অমৃতা এই মৈত্রেয়ীর কাছে আরও একবার হার মেনে চুপ করে রইলাম। কিন্তু মেয়েটা ছাড়ছে না, চাপা গলায় বলছে "আচ্ছা তুমি পালিয়ে আসনি তো? পার্টি-ফার্টির হয়ে কোনও একটা কান্ড ঘটিয়ে যারা গা-ঢাকা দেয়, তাদের কেউ নও তো?" সে আমার গলা, ঘাড়-টাড় সব শুঁকছিল আর বলছিল; যেন গায়ে পালানোর গন্ধটা লেগে থাকে, ও পেয়ে যাবে।

পায়নি, বোঝাই গেল। কেন না একটু পরে ঢিলে ঢালা হয়ে আমার গলায় দু'হাত জড়িয়ে সে বলল "যাক গে, আমার অতো ভয়-ডর নেই। খালি খুব বিদ্দেন, পণ্ডিত-টণ্ডিত না হলেই হল সেই লোকটার মতো, যে আমাকে খালি পকেট নিয়ে খালি ইংরিজি পদ্য শুনিয়েছিল।

এত জাতের লোক, তার মধ্যে এই বয়সেই মেয়েটা কোন্ জাতটাকে যে শত হস্তের দূরে রাখবার, সেটা জেনে নিয়েছে, এতে তার প্রতি আমার যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা হল।

আলো নিবিয়ে কখন ও আমার পাশে শুয়ে পড়েছিল, সে তার আগে বাটিতে ভরে এনেছিল কাঁকড়ার ডালনা, সে চেটে-পুটে খেয়েছিল কাঁকড়ার দাঁড়া আর আমি শুধু ঝোল, এই দেখেই মেয়েটা সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হয়ে আলো নিবিয়ে দেয়, পাশে এসে শোয়, তখন আমি এবার আর তার বুকের দুটি উদ্ভিদ, যারা ছত্রাকপ্রতিম, তাদের আর দেখতে পাই না, অন্ধকারে নিরুদ্দেশ তাদের শুধু অনুভব করি, পাশ ফিরে শুয়েছে মেয়েটি কিন্তু ও-পাশ ফিরে, অর্থাৎ অনুমানে জেনে গেছে অভ্যস্ত খেলাটা হবে না, শুধু ককিয়ে ককিয়ে একবার বলেছিল "বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি বিধবার মতো, একেবারে নিরিমিষ্যি, কিংবা তোমার বহুৎ শুচিবাই। কিন্তু আমার কোনও রোগ নেই। একেবারে সাচ্চা কথা মাইরি, এক লেডি ডাক্তার মাসে একবার আসে, আমাকে পরীক্ষা করে যায়, তার হাতে লিখে-দেওয়া সার্টিফিকেট আছে, বালিশের তলায়, ইচ্ছে হলে বের করে দেখে নিও"—কাতর স্বরে বলেই সে ও-পাশ ফিরে অকাতরে ঘুমোতে শুরু করেছিল।

আর আমি? আমিও আবার জড়িয়ে গিয়েছি ঘুমের সুতোয়, স্বপ্নের আঁশ-আঁশ তুলোয়, আমার পিঠের নিচে হাজার কাঁকড়ার চিবোনো দাঁড়া আবার সজীব হয়ে বেঁকে বেঁকে উঠছে, আমার বুকে, গলায়, দেহের ভাঁজে ভাঁজে কাঁকড়ার ঝোল। আমার সমস্ত চেতনার উপরে, সমস্ত যাতনার উপরে, সেই ঝোল ছড়িয়ে গিয়ে শুকিয়ে চিটচিটে হয়ে যাচ্ছে। যদিও তখন আমি অর্ধেকটা গাড্ডায়, অর্ধেকটা নদীর জলে, এই অবস্থায় চিৎ হয়ে শুয়ে, তবু ঝোলের ফোঁটা

টপ টপ ঝরে অনুভূতিকে এঁটো করে দিচ্ছে, এই সঞ্চারিত রোমাঞ্চটাকে চ্যালেনজ করলাম সরাসরি। কাঁকড়ার রস তো পড়ছে আমার শরীরের উপরে, তা-হলে মনটা চিটচিটে হয়ে যাবে কী করে? (মন তো যদ্দুর শুনেছি দেহের ঢাকনার তলায় থাকে, টানটান হয়ে।) কে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল "মূর্খ, তাও জানো না? চুইয়ে চুইয়ে। বৃষ্টির ফোঁটা যেমন পড়ে গাছের পাতায়, মাটিতে; পরে কি পাতালে কি নামে না? নামে নানান ফুটো আর ফাটল দিয়ে। আমাদের শরীর হল একটা ঝাঁঝরি, তার নীচে নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত বা ওই জাতীয় কোন ধাতব পাতের মতো মন পাতা আছে। সেই কথায় বুঝলুম, আমাদের রোমকূপ-গুলো আসলে ফাঁক আর ফুটো, আমাদের ব্যক্তিত্ব-চরিত্রের মতো আমাদের শরীরেও ছিদ্র অজস্র। তিনি বোঝাতে থাকলেন, 'দেহ আর মনের মধ্যে একটা গূঢ় গোপন লেন-দেনের কারবার অবশ্যই আছে। উভয়ের মধ্যে দেহই উত্তমর্ণ, মন নিম্নবর্ণ খাতক, এই হেতুই দেখি যে, তস্মিন্ তুষ্টে মনও তুষ্ট, দেখি না? নতুবা তেতে পুড়ে আসার পরে বালতি বালতি জল ঢেলে নেয়ে নিলে গা না-হয় শীতল হল, চিত্তও তৎক্ষণাৎ স্নিগ্ধ হয়ে জুড়িয়ে যায় কী-প্রকারে?' তিনি অদ্ভুত এক ভাষায় অশেষ মুদ্রাসহযোগে আমাকে এই সব বোঝাতে থাকলেন, আজকাল প্রায়ই বোঝান। যেহেতু আমি দিনমানে পড়া ফাঁকি দিয়ে থাকি, তাই ঘুমের ঘোরে এইভাবে কোচিং ক্লাশ নেন।

তাঁর সেই হাতের মুদ্রা গুনতে গুনতে আর পাশের মেয়েটার ফোঁস ফোঁস শুনতে শুনতে আমি ঘুমের আঁশগুলোর মধ্যে জড়িয়ে যেতে থাকলুম। মানে নিজেকে জড়িয়ে যেতে দিলুম, আমি। কখন ওই ফোঁসফোঁস করা মেয়েটাকে আঁকড়ে ধরেছি মনে নেই, সেই গন্ধ, সেই নিবিড় গা; চমকে সে বিড়বিড় করে বলে উঠল "কী?" বললাম "ঘুমোতে চাই।"

"পারছ না?"

"না।"

"কী হলে পারবে?"

"তুমি যদি একটা কিছু হও—তবে।"

শুনে সে খানিকটা মায়ার ছোঁয়া হয়ে সরে এল। কেমন চাপা, বসা গলায় বলল, 'কী হব আমি, হাওয়া, না বিষ্টি?' এই কথায় আমি একবারে বাচ্চাটি হয়ে তাকে বললাম, "হাওয়া নয়। হাওয়া বড় উতলা। আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, যেতে চায়। তুমি হও বৃষ্টি।"

সে বৃষ্টির ঝমঝম্ ধারা হয়ে আমাকে ভিজিয়ে দিতে থাকল কানের মধ্যে মন্ত্র পুরে দেবার সুরে বলতে থাকল "তাই তো। ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি তো কাটলেট খাওনি, রোস্টও চাওনি, মেনু থেকে বেছে নিয়েছ শুধু সুপ আর পুডিং।" তখন আমার বাঁধানো পাটিটা খুলে অন্ধকারেই তাকে দেখালাম।

আন্দাজেই দাঁতের পাটিটা হাত বাড়িয়ে এলাচ কেড়ে নিল। হারমোনিয়ামের রীড্ টেপার মতো আমার ধার করা দাঁত একটার পর একটা টিপে বলল "কার?"

"তা তো জানি না। যার দাঁত, হয়ত সে নেই, কবে মরে গেছে। কিন্তু রেখে গেছে তার দাঁত। আমি বয়ে বেড়াচ্ছি। স্মৃতিভার নিয়ে আমি পড়ে আছি. ভারমুক্ত সে এখানে নাই।" আমি বললাম, খুব উদাত্ত গলায়, হ্রস্বদীর্ঘ স্বরাঘাত সহকারে, তবে কতকটা প্রোজ-অর্ডারে, অর্থাৎ গদ্‌গদ্‌ গদ্যের আকারে, নইলে এটাও যে পদ্য, সেটা টের পেলে মেয়েটা চটেও যেতে পারে, ঠিক নেই। ওরও স্মৃতি আছে।

কিন্তু ধরিত্রীর মতো সর্বংসহা মেয়ে, যে অনেক সয়েছে অনেক দিয়েছে, কী আমার আওড়ানো পদ্যে, কী দাঁতের আদি বৃত্তান্তে তার দাঁতকপাটি লাগল বলে মনে হল না। ওকে ভয় পাইয়ে দিয়ে কাবু করতে কিছু ফন্দী-ফিকির ভাবতে লেগে গেলাম, ওই শুয়ে শুয়েই। কিংবা কাতুকুতু দিয়ে হাসাতেও পারি। মোটের উপরে একটা কিছু তো করা চাই, দেওয়া চাই? ওকে কাতুকুতু, দিচ্ছি, বগলে, পাঁজরায়, যেখানে একটু আগেও খাটো জামাটা ছিল, এখন নেই, এই কথাটা ভাবতেই আমার পেটে ভীষণ মোচড় লাগল, হাসির খিল খুলে গেল, মেয়েটা উঠে বসে সপাং করে সেই কথাটা দিয়ে আবার মারল, "তুমি কে?" বুঝলাম ওই চিন্তাটা একটা মাছি, ফিরে ফিরে কামড়াচ্ছে ওকে, তাড়ালেও যাচ্ছে না। বলো তো কে? তুমিই তো বলবে। আমি জানি না, খুঁজতেই তো বেরিয়েছি। মনে মনে এইসব কথোপকথন তৈরী হয়ে গেল, দেখলাম। মেয়েটা খাট থেকে এঁকে বেঁকে নেমে গেল, সাপ যেমন নেমে যায় পানা পুকুরের জলে, সেই ধরনে। মরা খানিকটা চাঁদের আলো পড়েছিল আলনার তলায়, যেখানে আমার ছাড়া জামাটা ঝোলানো, ওর বক্ষ-রক্ষক শিকেটা যেখানে টাঙানো, তার পাশেই, মেয়েটা—তার পরণে এখন শুধু তার বিনুনী, আর কিছু নেই—সেখানে গিয়ে পকেট হাতড়াতে থাকল।

বললাম "আমার পরিচয়পত্র খুঁজছ নাকি? আমার কিন্তু ছাপানো কার্ড-টার্ড কিছু নেই।"

ঘাড় ফিরিয়ে সে বলল, "না, টাকা।" বলে টেরচা চোখে হাসল।—"পুডিং-এর দাম!" কাছে এল—"এই মানুষ! তুমি পুডিং খাও কেন? ও খেয়ে বাঁচা যায়?"

বললাম—"পুডিং মুখের মধ্যে গলে যায় বলে।"

"তা নয়," সে খাটের ধারে বসল। "তুমি আসলে ঘেন্না কর।" ওর হাতে কাগজের নোট খসখস করছিল; কত সরিয়েছে বোঝা গেল না। ঘড়ঘড়ে গলায় বললাম "সব নিয়ো না।"

"সর্ব কি তুমিই দিতে পারো? নেব না মশাই নেব না। বাসভাড়াটা রেখে দেব।" ঠুন করে সে পাশের টেবিলে খুচরা রেখে দিল।—"সকালে তুলে নিয়ে চলে যেও।" এবার সে বালিশের তলায় হাত দিচ্ছিল, বোধহয় সেই লেডি ডাক্তারের সার্টিফিকেটটা যেখানে আছে বলেছে, সেইখানে। সার্টিফিকেট আর টাকাটা একই খামে রেখে দেবে।

দিলও। তারপরে চাদরের তলায় সারা শরীরটা চালান করে দিয়ে বলল "এইবার বলো। ঘেন্না করো, না?"

বললাম "তা যদি বলো একটু করি বৈকি। তোমার এই শরীরটা কত জনে পেয়েছে, ছেনেছে।"

বাধা দিয়ে সে বলল "খচ্চড় তোমরা, এক একটি। আচ্ছা, তুমি কি নিজের বাড়িতে বাস কর?"

"না ভাড়াবাড়ি। বাইরে গেলে হোটেলও থাকি।"

"সেই বাড়িতে আগে বুঝি কেউ বাস করেনি? অন্যের বাস-করা বাড়িতে থাকতে ঘেন্না নেই, যত ঘেন্না এই আমাদের এই শরীরটার বেলায়? বাঃ। হোটেলে যে বিছানায় শোও, সেই চাদর, সেই বালিশ, যাতে খাও, সেই কাপ, সেই ডিশ্— কত জনে যে! ঘেন্না হয়নি? হোটেলের ঘরে যারা থেকে গেছে, তাদের কেউ কেউ হয়তো মরেও গেছে, তোমার ভয় করেনি?"

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম 'সেই তো কথা, তাই তো। ঘেন্না নয়, ভয়। আমার ভয় করে সত্যি। তোমার এই ঘরে যারা এসেছে, আসত, তাদের কেউ কখনও মরেনি?

"মরেছে." সে চাদরের তলা থেকেই উত্তর দিল। "একজন তো এই ঘরেই। এক হিসেবে বলা যায়, আমিই তাকে মেরেছি।" বলতে বলতে সে পাড়ের দিকে নৌকোর মতো আমার দিকে ভিড়ে এল। 'ভয় করছে, খুব ভয় করছে নাকি?

হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে বললাম "না, না, এখন আর ভয় কী। দ্যাখো, ঠিক বলেছ তুমি। এক শহরে হয়তো দ্বিতীয়বার গেলাম, কিন্তু ঠিক সেই শহরটাতেই কি? বদলে গেছে। আগের বার যারা ছিল, তাদের সবাইকে কি দেখতে পাচ্ছি?"

"অনেকে চলে গেছে। মরে গেছে।" সে আমার কথায় খেই জুগিয়ে দিল। -সবাই থাকে না, অবিকল তেমনটি কিছুই নেই।"

"তেমনই এই পৃথিবীটাও" তখন আমি কনফুশিয়াস অথবা ধর্মরূপী বক, অথবা বুদ্ধ, প্রজ্ঞাপারমিত, সাতটি জ্ঞানের স্তম্ভের যে-কোনও একটিতে পরিণত হয়ে গিয়েছি। প্রত্যাদিষ্টের মতো গলায় বলে চলেছি, "যেমন এই পৃথিবীটাও। আজ অবধি এখানে এত কিছু মরেছে, এখনও মরছে, নষ্ট হচ্ছে। তবু তো মড়ার ভার নিয়েও নিয়মিত ঘুরছে? আর সেই পৃথিবীকে আমাদের তো কই, ভয় করছে না, ঘেন্না হচ্ছে না, আমরা সেখানেই খোস মেজাজে বহাল তবিয়তে বাস করছি!"

বিস্ফারিত চোখে আমার মুখে এত ওজনদার তত্ত্বকথা শুনে মেয়েটা তৎক্ষণাৎ কাৎ হয়ে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেল। বুঝে নিয়েছে আমি বড় জোর বদ্ধ পাগল, তাব চেয়ে গোলমেলে কিছু নই। এতক্ষণে কি ওর বিশ্বাস উৎপন্ন করতে পেরেছি?

কিন্তু আমি কে সেই কথাটা এবার ফিরে আমাকে দংশন করতে শুরু করেছে। ঘুরে এলাম মেম্‌ফিস, নিনেভ্‌। বাবিলনের শূন্যোদ্যান অবধি আমার ঘোরাঘুরির চৌহদ্দি। ঘুম নেই। সমরখন্দের মহলের পর মহল, পরে মোগল হারেমের পর হারেম, অবশেষে দমদমায় রবার্ট ক্লাইভের বাগানেও উঁকি ঝুঁকি দিলাম, ঘুমের খোঁজে, কোথায় ঘুম? কোথাও নেই, বেমালুম গা-ঢাকা দিয়েছে। পয়লা নম্বরের অ্যাবস্‌কন্‌ডার, বেটাকে খুঁজে বের করতে অন্তত দশ ব্যাটালিয়ন পল্টন দিয়ে তালাস চালাতে হবে। ভেড়া গুনলাম, একের পর এক; যত ভেড়া জড়ো হল, গোটা অস্ট্রেলিয়াতেও তত নেই। গুনে গুনে ঘুম আনব কী, দেখলাম ভেড়াগুলো শীতে কাঁপছে, লোম ছাঁটা গেছে সব ক'টার, আহা বেচারাদের নিজেদের চোখেই ঘুম নেই!

আমি কে? আমি কী? কথাটা নিবু-নিবু সলতের মতো থেকে থেকে দপদপ করে উঠছিল। কোন্ প্রশ্নটা বেশি প্রাসঙ্গিক—আমি কে, না আমি কী? বিকল্পের গন্ধ পেয়েই আমার মগজের পোকাটা বলে উঠল, "ঠিক ঠিক। আমি কে বললে আগেই মেনে নেওয়া হয় আমি মানুষ, 'কী' বললে বোঝায় যতেক বস্তু কিংবা প্রাণী। 'কে' কথাটার মধ্যে বড্ড অহংকার!"

বললাম "কথাটা যখন আমাকে নিয়ে, তখন এর সবটাই তো অহংকার। মগজের পোকাটা চুপ করে গেল, এই কূট তর্কের পাঞ্জা লড়তে তার তেমন গরজ দেখা গেল না।

তখন আন্দাজেই লড়ে যেতে থাকলুম।

আমি কে, আমার বয়স কী। আমি কি সেই বয়সে পৌঁছে গেছি যে-বয়সে একটা বয় হলেও হয়, বউ হলেও হয়, বয়—বউ দুই-ই এক, অর্থাৎ শুধু তদারকি? শাল-গ্রামকে শোয়ানো বসানো আর কী। মন-টন জোগানো নয়, স্রেফ টিকে থাকার জন্যে দরকারী যা আর যা।

আমি কি সেই ইংরাজী কবিতায় পড়া শুকনো মাসের বৃদ্ধ ব্যক্তি, যাকে কোনও ছোকরা কিছু পাঠ করে শোনায়, এক বৃষ্টির অপেক্ষায় আছি? জানি না। মনে পড়ছে না।

শুধু মনে আছে, তখন ঝমাঝম বৃষ্টি সুরু হয়েছিল। শহরে ঝমাঝম বৃষ্টি হয় কম, তাব শব্দ অন্য রকম। কলকল কলকল? হবেও বা। মনে হয় দেওয়াল-ন্যাওটা পাইপগুলো হৃদয়ে ঢেলে দিচ্ছে—দরদর ধারায়, অবিরল।

আমি উঠে পড়েছি এলাচ টের পেয়েছিল ঘুম ভেঙে গেছে, এলাচও উঠে বসেছিল। কী ভাবছিল সে, ওর চোখে সেই সন্দেহটা আবার কি ফিরে এল? নতুবা ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে আছে কেন। এলাচ, তোমার চোখ সরাও, আমি সইতে পারছি না, পিঠে বিঁধছে। তুমি এই ঘরেই একজনকে কবে নাকি মেরেছিলে মনে পড়ে যাচ্ছে।

—"কোথায় যাচ্ছ, কোথায় যাচ্ছ তুমি?—হিসহিস্ গলায় এ-কথা কে বলল, এলাচ, চুলগুলোকে আঁটসাট বেঁধে যে ঝুলিয়ে দিয়েছে দুই কাঁধে, সেই

সাপিনী?

—"এই একটু চাতালে গিয়ে দাঁড়াব।"

উঠে এসেছে সে ছিপের মতো সপাং বেগে, কাপড়টা জড়িয়ে নিয়েছে কোন মতে।

—কেন, চাতালে কী?

বললাম, ব্রিষটি। 'ঋ'-কারটাকে 'র'-ফলার মতো ওজন দিয়ে।

—বিষ্টিতে কী?

বললাম, ভিজব। বৃষ্টির জলে নীচের ছোট জামাটামাগুলো নিজে থেকেই কাচা হয়ে যায়। তাই "যেদিনই বৃষ্টি পড়ে আমি ভিজি। ধৌত হই। জল আমার ভালো লাগে," যেহেতু জলের রঙ নরম।

এলাচ শুনল না, ছুটে এসে আমার মুঠি চেপে ধরল, হিংস্র, বন্য, ফুঁশছিল। বলল মতলব বুঝেছি তোর। এই চাতালের পাশের ঘোরানো সিঁড়িটা দিয়ে সট্‌কে পড়বি, সেই তাল—বুঝেছি (এলাচ, আমার এলাচ, আমাকে 'তুই' বলল। এই এলাচ কবে যেন, কাকে যেন, এই ঘরেই মেরেছিল, ওর কবজিতে খুব জোর, ছাড়াতে পারছি না।)

—টাকা না দিয়ে পালাবার ফিকির? (যদিও আমি খুব গদ্‌গদ্‌ কাঁদো-কাঁদো গলায় বলছি, 'এলাচ', তুঁমিও এঁকটু ভেঁজো না, চুঁল খুঁলে এঁলো করেঁ দাও, কারণ পানের প্রসাদে আমার স্বর সংগতরূপেই প্রত্যাশিত অনুনাসিক, তবু এলাচ সে-সব কিছু শুনছিল না, আমাকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলছিল, চিনেছি তোকে, তুই সেই মিনমিনে বদমাস, আমাকে যে নেকু-নেকু পদ্য শুনিয়েছিল, সেই না? টাকা না দিয়ে কাটতে চাইছিস্‌। তোরা সব সমান। ঠিক করে বল, তুই-ও লিখিস না?

—লিখি, এলাচ, কিন্তু মাইরি বলছি আমি সে না। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

এলাচ বলল, খবরদার, তুই আমার গা ছুঁবি না। মেনিমুখো যতো সব, মহা-ধড়িবাজ। কী লিখিস, কী লিখিস তুই?

কাচুমাচু মুখে বললাম, এই আর কী, তেমন কিছু নয়। যা মনে আসে, তাই।

—কী দাম দিস, তার জন্যে, তোর লেখার জন্যে?

এতক্ষণ তবু বোধগম্য হচ্ছিল, এবার আমার চোখ কপালে উঠে গেল।

দাম? লেখার জন্যে দেব দাম?

খুব কৃপা করে ওকে বললাম, দূর পাগলি! দাম দেব কী, আমরা তো দাম পাই।

এলাচ বলে উঠল, তাই তো বলছিলাম। তোরা যা দিস, তার জন্যে দাম নিস। যা নিস, তার জন্যে দিস না। ঠিক আমাদের মতো। বেশ, এবার আর-একটা কথার জবাব দে। যা লিখিস, তা কেন লিখিস?

—ইচ্ছে হয় বলে।

—শুধু নিজের ইচ্ছেয়, কারও হুকুমে নয়, ফরমাসেও না? কেউ লিখিয়ে নেয় না?

তোতলা তোতলা গলায় বললাম, তা নেয়, কেউ টাকা দিলে বা দেবে বললে—এই কথা শুনে তলপেটে হাত রেখে এলাচ যেন একপেট হাসি খালাস করে দিল।—আরে, তাই তো বলছিলাম, তোরা ঠিক আমাদের মতো। আমরা যেমন মুজরো খাটি। নিজের খুশিতে নয়, পর-রুচি মাফিক শুয়ে পড়া। তোতে আর আমাতে তবে তফাৎ কী?

বলতে বলতে এলাচ করল কী, আমার পাঁজরার তলায় একটা ধাক্কা দিল, সেই পিছল চাতালটার দিকে।

—ভাগ! পালা। ক্রমাগত আমাকে ঠেলা দিল সে, আর খিল খুলে দিয়ে হাসছিল। কান ঝাঁ-ঝাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম—ভাগ্ পালা। তুইও বেশ্যা আমিও বেশ্যা। বেশ্যা কি বেশ্যাকে বসায় নাকি। মেয়েতে মেয়েতে কিচ্ছু হয় না।

বলেই এলাচ চাতক পাখির মতো উপর দিকে চোখ তুলে চিৎকার করে ডাকছিল, মাসি, ও মাসি।

আমি আজও জানি না, এলাচ সেদিন নেশার ঘোরে ওই কান্ড করেছিল কিনা; অথবা সে কি সত্যিই বিশ্বাস করেছিল ও যা, আমিও তাই? হেঁচকি তুলে তুলে সেই বিষাক্ত বিশ্বাসটাই ব্যক্ত করছিল? আর মাসিকেই বা ডাকছিল কেন, দু'জনে মিলে আমাকে সত্যিই মারত না তো? এলাচ ওই ঘরেই একজনকে মেরে ফেলেছে।

সেদিন পালিয়ে এসেছিলাম। সেই এলাচের মুখোমুখি আমি আজ। অথচ একটুও ভয় করছে না। কারণ ইতিমধ্যে এলাচ নিজেই মরেছে যে, এখন আর আমাকে মারতে পারবে না।

[এই স্বচ্ছ, কাকচক্ষু নিশ্চয়তা দিয়ে সে, এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র, তার স্বগত ভাবনা শেষ করল।]

॥ চার ॥

বিতাড়নের পালাটা কি সেই থেকে শুরু হয়েছে, অথবা শুরু হয়েছিল আগে থেকেই, সেদিন শুধু ঘণ্টা বাজিয়ে "ছুটি, তোমার ছুটি" জানিয়ে দেওয়া হল?

প্রত্যাখ্যান এর চেয়ে স্পষ্ট চেহারা নিয়ে আগে কখনও আসেনি। চোখে চোখে বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা, তাকানো যায় না, দুপুরের সূর্যের মতো যেন অন্ধ

করে দেয়। তাইতো কালো চশমা পরে নিয়েছে সে, তবু ছুটছে, আশ্রয় চাই একটু, বালুস্তূপে কি উচ্চ বৃক্ষচূড়ে, যেখানে হোক। পাখির নীড়ের মতো—কোথায় সেই চোখ কিংবা ঠোঁট? হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি—হাজার বছর এখনও কি শেষ হয়নি?

ঘরে আবার একটু আলো, কে এল? বিনীতা? বিনীতা এত ঘন ঘন আসে কেন। এখন সে যে খাতাপত্র বিছিয়ে বসেছে হিসাব করবে বলে, খাতাপত্র, কাগজের স্তূপ, কিন্তু সেই পাশবইটা গেল কোথায়, যেটাকে সে খুঁজছে, সারা জীবন ধরে অনেক অন্যায়, অনেক অপচয় তবু কিছু-না কিছু সে নিশ্চয় জমিয়েছে, কিন্তু কোথায়, পাশবইটা খুঁজে পাচ্ছে না। এই সময়ে, সব যখন বিশৃংখল, ছড়ানো, তখন ঘরে এই হঠাৎ আলো, অবাঞ্ছিত একটা ঝলক।

বিনীতার ঢুকে পড়াটা, কেমন যেন গা-শিরশিরে মনে হয়। যেন স্নানের ঘরে কেউ যখন সম্পূর্ণ অনাবৃত, তখন অস্বস্তিকর একটা ছায়া পড়া, কৌতূহলী কারও অনধিকার প্রবেশের মতো। মনে হয়।

বুঝেছি, বিনীতা কেন এসেছে। এখন হয়তো বেরুবে, তাই দরকার কিছু আছে কিনা জেনে নেবে, বলে দেবে খাবার টাবার কোথায় ঢাকা দেওয়া রইল। মানে, এখন থেকে খানিক আগে বোধ হয় বিনীতা স্নান সেরেছে—প্রাতে কখন দেবীর বেশে?—ওর সেই সম্ভ্রান্ত চেহারা এখন, বারান্দায় টাঙানো খাচার ময়নাটাকে জল ছাতু সব বোধহয় এইমাত্র দিয়ে এল, এইবার তার পালা। বিনীতা কী দেবে—তাকেও ছোলা-ছাতু? তাকেও? সেও বিনীতার নিত্য-কর্তব্য, প্রাত্যহিক রুটিনের অন্তর্গত?

বিনীতা, এসেছই যখন, আমাকে পাশবইটা খুঁজে দাও, পাচ্ছি না। যাবার আগে মিলিয়ে নেব, খরচ করেছি কী-কী, আর জমা কত।

—একী, আপনি ফের শুয়ে, ঘরটাকে আবার অন্ধকার করে ফেলেছেন। হল কী?

সদ্য-স্নাত বিনীতার গলা খুব তাজা, খুব স্বাভাবিক।

তার মানে পাশ বইটা খুঁজে দেবে না। যারা খুব স্বাভাবিক গলায় কথা বলে, তারা কিছু খুঁজে এনে দেয় না।

তা-ছাড়া পাশ-বইটা বিনীতার কাছে নেই-ও। তারা কোথায়, যারা জানত? ললিতা, মিনা, সীতা প্রভৃতি? স্বপ্ন ঘুচে স্মৃতি আবার ঝাঁকে ঝাঁকে ভীমরুলের মতো আক্রমণ করল।

ললিতা, সীতা, মিনা প্রভৃতি, তোমরা দয়া করো। তোমরা ক্ষমা করো। দেখছ না, যন্ত্রণায় কী কাতর আমি, কত শাস্তি পাচ্ছি? অন্যায় করেছি তোমাদের সঙ্গে, তোমাদের প্রতি অন্যায় করেছি। তার প্রায়শ্চিত্ত, তার শাস্তি। একটা শাস্তি তো আমার অনুক্ষণ ভাবনা। আর একটা শাস্তি বিশ্ববিচার সম্পর্কে

আমার নিগূঢ় বিশ্বাস, রেহাই পাব না—এই নিশ্চিত ধারণা। মাথা পেতে নিতেই হবে। তাঁর আঘাত, তাঁর করুণা। হ্যাঁ, করুণাও নির্মম হয়ে নামে তাদের উপরে, যাদের প্রতি তাঁর সতত সজাগ দৃষ্টি, অনিদ্র প্রহরা। তাদের তিনি রেহাই দেন না। খুব ভালবাসেন কিনা, আমি বিশেষভাবে নির্বাচিত যে, জাতি হিসাবে একদা যেমন ছিল ইহুদী। তাই কষ্ট, পরীক্ষা, শাস্তি ইত্যাদি এত বেশি। পাই-পয়সা মিলিয়ে মিলিয়ে। নইলে একই কীর্তি, এর চেয়েও অনেক বেশি কীর্তি করে, অধীর, সুবীর ইত্যাদি কতজন পার পেয়ে গেল, আমি আটকে গেলাম কী-করে। হ্যাঁ আটকে গেছি তাঁর কাছে। যেন রেলগেটের টিকিটবাবু একে একে ছেড়ে দিলেন কত বিনা-টিকিটের যাত্রীর পর যাত্রী, হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেছেন আমাকে। উচিত শিক্ষা দেবেন বলে।

কিন্তু কেন, টিকিটবাবু, কেন, কেন। এর পরও আপনার বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ, বিপুল কোনও ইচ্ছা পূর্ণ করব বলে? সেই ভরসায় আছি। আশার চুষিকাঠিতে ওষ্ঠ, কপোল সব লিপ্ত করে বসে আছি।

—আপনার হল কী। না হয় বন্দী হয়ে আছেন এই ঘরে, কিন্তু দিনরাত অন্ধকার করে—

সেই গলা, বিনীতার। কান পেতে শুনে সে বলে উঠল, বিনীতা, আমি প্যাঁচা হয়ে গেছি।

কিন্তু বিনীতা তো ললিতা, মিনা, সীতাদের কেউ নয়, ঠিক বুঝল কি কথাটা? শুধু চাবির রিং ঘুরিয়ে বলল, আমি যাচ্ছি।

বিনীতা, যেও না, শোনো। তুমিও বিধাতা হয়ো না। ওদের প্রতি আমি যদি অন্যায় করেও থাকি, এক অর্থে আজও কিন্তু বিশ্বস্ত রয়েছি। বিরহ-দিগন্ত পারায়ে সারা রাতি—সারাক্ষণ তাদের কথা ভাবা, তাদের সঙ্গে থাকা, এ-ও কি বিশ্বস্ত সহবাস নয়? অনবচ্ছিন্ন সহবাস, অনুশোচনা, অথচ কখনও তা ক্লান্ত করে না।

বিনীতা, একটু আগে তুমি বলেছ আমি বন্দী। এই হিসাবে, একটা বয়সের পরে বাকী জীবনটাই তো তাই। আমরা কয়েদী। এই জন্ম, এই বাঁচা। কিন্তু কয়েদখানাতেও ঘুলঘুলি থাকে। আমাদের এই বেঁচে থাকা নামে গারদেও আছে—দু'টি কি তিনটি। এক—আকাশ, যখন তাকিয়ে দেখি। দুই—সমুদ্র, যার সকাশে আমরা সহসা উদার এবং সাহসী। তিন—তিন, বলব, বিনীতা, বলব? তৃতীয়টি হল মেয়েদের চোখ, আয়ত কালো অক্ষি। গারদখানার গবাক্ষ—আমাদের ঘুলঘুলি।

কিন্তু বিনীতাকে এ সব বলা হল না, সে শুধু বলতে পারল, যাচ্ছ? যাও। আমিও ভাবছি, আজ বিকেলের দিকে একটু বেরুব।

আর পলকে বিনীতার সেই শান্ত-উষা মুখছবি যেন বদলে গেল। রক্তহীন, সাদা, সে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, বেরুবেন কী বলছেন? না, না, খবরদার, ও সব বাড়াবাড়ি যেন করতে যাবেন না আপনি।

—বেরুনোটা বাড়াবাড়ি? এ-কথা তাকে বলছে বিনীতা, তাকে, যে কিনা এক-সময়ে চরকির মতো ঘুরত, চষে ফিরত গলির পর গলি!

—সে সব দিন গেছে।

—হ্যাঁ, সে সব আগের জন্ম, বুঝতে পারছি।

—কথা রাখুন। কথা দিন বরং, যাবেন না?

বিনীতা দাঁড়িয়েছিল, দরজায় ওর দৃষ্টি ছুটে আসছিল। হাত দুটি ওর জড়ো করা বুকের কাছে, তবু দু'টি হাতই যেন এগিয়ে এসে মিনতির মতো ওকে চেপে ধরেছিল।

বিনীতা এক পা হয়ত এগিয়ে এলও।

—আপনি জানেন না, সময়টা কী সাংঘাতিক।

—জানি না? তবে এখানে কেন অন্তরীন হয়ে আছি?

—রাস্তার মোড়ে ওরা নজর রাখে। অচেনা কাউকে দেখলেই—

—জানি, বিনীতা, সব জানি।

—এই ভাবেই তো ওরা এক দিন আমার দাদাকে—

—শুনেছি। সুব্রতেশকে হাসপাতালে দেখেওছি। কিন্তু আমি তো কোনও দলে নেই বিনীতা, আমাকে মারবে কেন?

—তবে হুলিয়া বেরুল কেন। পোস্টারই বা পড়ল কেন, আপনার নামে?

—বোধহয় ভুলে। আমার নামে অন্য কারও নাম, আমি সেটা আমার বলে ধরে নিয়েছি। মিস্‌টেকেন আইডেন্‌টিটি। জানো, মরবার ভয় তো আছেই, তার ওপর আজকাল আর একটা ভয় ভর করেছে। যদি কেউ অন্য লোক ভেবে আমাকে মারে? তাহলে শহীদ হবার সম্মান বা সান্ত্বনাও যে ফুল্‌লি উশুল হবে না। ধরো, ছুরি বসিয়ে দিয়েই কেউ যদি বলে ওঠে, যাবাব্বা যাচ্চলে, এ বেটা তো সেটা নয়! তা হলে? তখন সেই মরবার মুহূর্তেও দুটো চোখ বিস্ফারিত করে কবুল করব নাকি, অন্য কেউ মরেছে, আমি মরিনি? মরেও ঠিক ঠিক মরতে না পারা, সে-বড় বিচ্ছিরি কষ্ট, ভীষণ অপমান, না?

—চুপ করুন তো, আপনি। দাদাও মরা নিয়ে ঠাট্টা করত, কিন্তু সেটাই সত্যি হয়ে গেল। সমাজ-সেবা, লোকের ভালো করার পাগলামিটা অবশ্য ওর ছিল, কিন্তু কোনও দলে ছিল না তো।...ওর সামনে একটা ঘটনা ঘটল। দাদা ঠিক দ্যাখেনি, কিন্তু পরে পুলিশ এসে ওকে ধরল। কী দেখেছে আর কাকে—জানতে চাইল। দাদা বলল, দ্যাখেনি। ওরা বিশ্বাস করল না। সুতরাং থানায় টেনে নিয়ে দাদাকে বিষম মারল।

—পুলিসেরও তো কাউকে ধরা আর মারা চাই, তুমি ওদের চোখ দিয়ে দেখছ না। নইলে খাতাপত্র ঠিক থাকে কী করে। কাউকে ধরে বা মেরে ওরা কর্তব্য বোধ সাফ রাখে।

সন্ধ্যায় দাদা ছাড়া পেয়ে ফিরে এল। ওরা পিছু নিল! টেলিফোনে প্রথম শাসানি, রাত ন'টায়। তখন এ-বাড়িতে টেলিফোন ছিল, দাদা যাবার পরে কেটে

দিয়ে গেছে।

—ভালই হয়েছে নইলে দিনরাত ক্রিং ক্রিং করত, সমস্ত স্নায়ু এক-একটা কল এলে, ঝনঝন করে বাজত। সহ্য করতে পারতাম না বিনীতা, এই অবস্থায় টেলিফোন আমাকে একেবারে জর্জরিত করে দিত।

—দাদাকে তাই তো করেছিল। সারা রাত ধরে টেলিফোন, কী ধমক, গালাগাল আর শাসানি! ওদেরও ধারণা, দাদা দেখেছে। দেখুক, বা না দেখুক. পুলিসকে বলে দিয়ে এসেছে।

—সন্দেহ স্বাভাবিক। এই সন্দেহে ওরা তো অনেক সময় নিজেদের ধরা-পড়া লোককেও মেরেছে। দাগ একবার লাগালে আর মোছা নেই। ভেতরে একবার ঢুকলে আর বেরুনো নেই।

—শেষ দিকে দাদা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। পর পর কয়েকটা কল—টেলিফোন আর তুলল না। তখন, শেষ রাতে বাইরের কলিং বেলটা বাজল।

—কলিং বেল, ডাকার ঘণ্টা, আর-একটা উৎপাত। তুমি ওটাকে ডিসকনেক্ট করে রাখো বিনীতা, নইলে ক্রমে ক্রমে ওই ক্রিং ক্রিংও সহ্য হবে না। গলায় সাড়া ফুটবে না।

—সাড়া না দিলেই বা। দরজা ভাঙতে ওরা জানে না? শেষ রাতে দাদাকে ওরা বিছানা থেকে তুলে ডেকে বাইরে নিয়ে গেল। একজন আমার দিকে চেয়ে থমথমে গলায় বলল, সুব্রতেশবাবুর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে!

বিনীতা মুখ ঢেকে মেঝেতেই বসে পড়েছিল। কিন্তু সে তখন ভয়াবহ একটা রসিকতার নেশায় পড়ে গেছে, অবলীলাক্রমে বলে গেল—কিন্তু কথা তো কয়েকটা নয়। মোটে দুটো। পর পর দুটো গুলি, বিনীতা, আমি শুনতে পাচ্ছি। পুলিসও মারল, ওরাও মারল। পুলিস, আধমরা করে ছেড়ে দিয়েছিল, ওরা সেটা পুরো করে দিল। ব্যস, আর কী। এক নিমেষে সুব্রতেশ শ্রেণী-শত্রুর দলে প্রোমোশন পেয়ে গেল। কিন্তু শ্রেণী-শত্রুর কোন্ শ্রেণী? যে-শ্রেণীতে রিকশাওয়ালা পড়ে, পড়ে ফেরিওয়ালা আর প্রাইমারি টিচার, একেবারে সেই শ্রেণী! ছি, বিনীতা, ওঠ, যেখানে যাচ্ছিলে যাও।

চোখ মুছে বিনীতা বলল, যাচ্ছি, কিন্তু কথা দিন, আপনি সাবধানে থাকবেন, কথা দিন?

—এতই যখন গেছে বিনীতা, এত যখন সহ্য করেছ, তখন আমাকেই বা কেন এত সাবধান করছ, কথাই বা চাইছ কেন?

টলমল দুই চোখ তুলে বিনীতা বলল, জানেন না, আপনি জানেন না?

চলে গেছে বিনীতা। আগেও, তারপর ওর ছায়া মিলিয়ে গেছে, সে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। বিনীতাকে কথা দেয়নি কিন্তু বাকী সময়টা তারই কথামত চলবে।

উঠুন আপনি, চান-টান করে ফেলুন, তারপর খেয়ে নেবেন, অন্নদাদি তো

রইল। আমি সাড়ে তিনটে কি চারটের মধ্যেই ফিরে আসব। স্কুল তো আজকাল ঠিক হয় না!

আপাতত বিনীতার অনুশাসন এই পর্যন্ত। সে মানবে। স্নান সারবে, খেয়ে নেবে, কিন্তু তারপর? আবার যখন বিছানায় টানটান ঘুমোবার উদ্যোগ, তখন সে ফের চলে যাবে না সেই মর্গে, ঝিমঝিম কড়া আতরের প্রসাধনমাখা এক পরিবেশ, সেখানে সবই ছায়া-ছায়া, লোকান্তরিত লোকেরা ছড়ানো-ছিটানো এখানে-ওখানে, তাদের আত্মাই শুধু বাঙ্ময়? অথবা, মর্গটাই চলে আসবে এই চিলেঘরে, যেখানে সব চাপা, ঢাকা-ঢাকা, প্রাণের শেষ উপস্থিতি বিনীতা, সেও বিদায় নিয়ে গেল একটু আগে, যেখান থেকে?

জানি না, আমি জানি না, সে চিৎকার করে বলে উঠতে চাইল, বিনীতা, তোমাকে সব কথা এখনও বলতে পারছি না। আগে যখনই একা হতাম, তখনই আমার সঙ্গী হত আমার কৃত অন্যায়ের পীড়া, ললিতা-সীতাদের প্রতি, আমার পরিবার-পরিজনের প্রতি, সে প্রবল একটা পাপবোধ—তারই সান্নিধ্যে-সাহচর্যে কত, নিঃসঙ্গ মুহূর্ত ভরে গেছে, আক্রান্ত হয়েও ব্যাপৃত থেকেছি আমি। সেই অপরাধবোধের নতুন দোসর জুটেছে সম্প্রতি—ভয়, আমার ভয়। ভয়কে নিয়েই বেশির ভাগ সময় এখন কাটে, বলতে কি সেই আমার সুয়োরাণী আজকাল, আর পাপবোধ? সে হয়ে গেছে দুয়োরাণী। দূরে সরিয়ে দিয়েছি সেই দুঃখকে, তবু একেবারে ছাড়িনি।

কিন্তু কিসের ভয়, এবং কেন।

সে একাকী কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছিল। মৃত্যুভয়? কিন্তু তাকে না আমি অতিক্রম করেছি বলে বেশ কিছুকাল বড়াই করছিলাম নিজের কাছে, তবে? ভুয়ো বড়াই, বাড়ফাট্টাই? আসলে মরার ভয় এখনও বিলক্ষণ আছে। অথচ কত না বলেছি একান্তে, 'ঘুচিয়ে দিয়েছি ওই ভয়, বিলকুল, কেন না জেনেছি জীবনের কাছ থেকে আর বিশেষ কিছু পাওয়ার নেই, একেবারে শেষ কী, তাও দেখে এসেছি, সুড়ঙ্গের বন্ধমুখ অবধি। বড় জোর আরও শ কয়েক টাকা উপরি রোজগার, আরও কয়েক শ'বার সহবাস—সসম্মত দৈহিক মিলন। একই দুঃখের পুনরাবৃত্তি, সে-দুঃখের বোধও আবার ক্রমক্ষয়িষ্ণু—ল অব্ ডিমিনিশিং রিটারনস্! সেটা আবার ক্রম-ক্ষয়িত শারীর শক্তিরও বটে। যাই হোক, সেটা সুখই—প্রাপ্তি নয়। আর কোনও প্রাপ্তি ঘটবে না যে জীবনে, নিশ্চিত জানি, সে জীবন গেলেই বা কী! থাকলেই বরং বহনেরই ক্লেশ খালি।'

এই সব বলেছি বৈরাগীর গলা নকল করে। এখন বুঝছি, বৈরাগী হওয়া যত সোজা, বীর হওয়া ততটা নয়। আমরা পারি না, মরণকে মুখে শ্যাম-সমান বলে আওড়াই বটে, কিন্তু মনে মনে সত্যিই তা ভাবি না।

না? এই পর্যন্ত ভেবে সে স্বকীয় ঠোঁট চাটল, নিজেকেই বলল—ভাবি না

কি সত্যিই? যদি না ভাবি, তবে সেই ভীতির হেতু খুঁজে বার করতে হবে।

এক: হয়তো এই যে, সুখকে যতোই ছোট বলে ভাবি, সুখের প্রতি টান যায়নি। শরীরের বিবিধ স্থিতি-স্থাপন এখনও হঠাৎ দর্শন মাত্র স্পৃহা আনে, স্নায়ুগুলি চিনির বলদের মতো উত্তেজনা বয়ে বয়ে সারা হয়, স্বাদ গেলেও স্মৃতি ওষ্ঠপুটে লেগে থাকে, তাকেই লেহন করি অথচ উচ্চৈস্বরে কিছু নয় কিছু নয় বলি, জীবন এমনই একখানা জিনিস বটে, স্বাদ গেলেও যার সাধ যায় না। আমরা প্রত্যেকেই যেন, অসতীর স্বামী। জানি, বউ হাতে নেই, তবু একেবারে হাতছাড়া হবে জানলে কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাই, থাকবে না জেনেও দু'হাত বাড়াই। সেই অসতীর নাম কী?—জীবন।

দুই: সাধ যদি যায়ও, মৃত্যুর রকম সম্পর্কেও ভয় অনেক রকম। সে কোন রূপ ধরে আবির্ভূত হবে, সব মরণই তো কিছু শ্যাম-সমান নয়। আগে আমাদের বাছ-বিচার ছিল রোগ নিয়ে। মনে মনে বলতাম, কলেরায় যেন না মরি। তার চেয়ে জ্বর ভালো, সব চেয়ে ভালো হঠাৎ স্ট্রোক—সেরিব্রাল, বা করোনারি। অজ্ঞান অবস্থাতেই নির্বাণে চলে যাওয়া, ডুব সাঁতার দিয়ে ওপারে ওঠার মতন। কহ মৃত্যু কানে কানে কথা। কানে কানে। চুপে, চুপে। ঘুমঘোরে এলে মনোহর—চমৎকার!

আর এখন, অসুখেই যে মৃত্যু হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই, অপঘাত যে ঘটবে না এই গ্যারানটি দেবে কে? মরতে ভয় যদি নাও পাই তবু ভাবি, সেই অপঘাতটার আকৃতিই বা কী হবে। যমদূতের হাতে থাকবে কী, লাঠি না বড় ছুরি, না গুলি, আততায়ীর, কিংবা পুলিসের? বলা বাহুল্য, পাইপ-গান্‌কেই সবচেয়ে প্রিয়তম ঠেকছে, কিন্তু বলা যায় না, পাবই যে। এ-বিষয়ে বিধাতার বিধান বড়ই কঠিন। এমনকি পুণ্যাত্মা হলেও তিনি ইচ্ছামৃত্যু অথবা বাঞ্ছিত মৃত্যু দেন না, পুণ্যাত্মাদের মধ্যেও পক্ষপাত ঘটান মরণের প্রকরণে। গান্ধীজী প্রস্থান করলেন "হায় রাম" মুখে নিয়ে, তিনটি মাত্র গুলিতে। কিন্তু যীশু—ঈশ্বরের পুত্র—তিনিও বলেছিলেন "ও পিতঃ," কিন্তু তবু তাঁর যন্ত্রণার অবধি ছিল না। তাঁর জন্যে তিলে তিলে মৃত্যু, ক্রুশ-কাষ্ঠ আর পেরেক ছিল নির্ধারিত।

এই দুইয়ের কোন্‌টা আমি পাব? অথবা আমার নিয়তি কি অগাধ নীলা-চলে মহাসমুদ্র?

যাই হোক, ভয় তবু আছে। মৃত্যু যখন দুয়ারে এসে দাঁড়াবে (কড়া নাড়বে, না কলিং বেল, নাকি, টেলিফোন? পাল্টা হিংসায় উন্মত্ত পুলিসের বুট?), তখন? কী বলে তাকে অভ্যর্থনা করব, কোন্ বরণ, কোন্ বয়ান—ওয়েলকম্ স্যার? স্যার, না ম্যাডাম? মৃত্যু পুরুষ, না স্ত্রী? না-পুরুষ, না-নারী ক্লীব-লিঙ্গকে কী বলে সম্ভাষণ করে, স্যার না ম্যাডাম, আমি তো জানি না।

সব ভয় উত্তীর্ণ হলেও একটু বাধা থাকে। আমার আছে। মৃত্যুকে বাইরে

দাঁড় করিয়ে বলব নাকি যে, ওয়েট এ বিট। আমার সব কাজ এখনও শেষ হয়নি, সব লেখা সারা হয়নি, অনেক কিছুই বাকী, সব যদি লিখে নাও যেতে পারি, তাও বলে যেতে হবে, মুখে মুখে, যত জনকে পারি, সকলকে, অন্তত সেই সময়টুকু আমার চাই, চাই-ই চাই—প্লীজ! ফাঁসির আসামী যেটুকু সাধ মেটানোর সুবিধা পায়, মাত্র তাই। বেশী না।

অপূর্ণ সাধ সবারই কিছু-না-কিছু থাকে। কী বলেছিল যাজক বেকেট্ যখন ক্যাথিড্রালে গুপ্ত মৃত্যু তার মুখোমুখি আসে? বলেছিল কি যে. "আমার শেষ প্রার্থনাটা শেষ করে নিই?" হিন্দু হলে কী বলত, পুজো? বসন্ত রায় তাই বলেছিল বুঝি? 'গঙ্গাজল গঙ্গাজল' বলে যখন চেঁচিয়েছিল তখন সে কি সত্যিই ওই নামে কোনও অস্ত্র চায় অথবা মরতে সম্মত হয়ে উঠতে চেয়েছিল পুজো সারা করে? জীবনে যত পুজো—আর, ইস, প্রায় একই কথা বলে মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে।

মাঝে মাঝে মনে হয়, ইদানীং। প্রার্থনা, পুজো নয়, তার চেয়েও ছোট ছোট অকৃতার্থ কাজ, যথা স্নান। শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়েছি, ঝর্ঝর জল, ঝর্ণা তলার নির্জন, কিন্তু যদি এই স্নান শেষ না হয়, তোয়ালেতে যেই মাথা ঘষছি, কিংবা মুখে ঘষছি সাবান, তখনই যদি যমদূত......তা হলে কি চোখে মুখে সেই ফেনা সমেত আমি, যাঃ, সে ভারী বিশ্রী। অথবা দাড়ি কামাতে কামাতে, অথবা মাথায় চিরুনি বোলাতে বোলাতে আয়নার সামনে—কার ছায়া, আয়নায় ছায়া যদি পড়ে? সিগারেট কিনছি দোকানে দাঁড়িয়ে, নুয়ে পড়ে দড়িতে ধরাচ্ছি, ঘাড়ের উপরে ঝুঁকে পড়ে ওরা কারা?...ধরানো কি সম্পূর্ণ হবে? ছোট ছোট এমন অনেক কাজই বাকী থাকে, থেকে যায়, যখন হঠাৎ "চলে এসো", কানের পাশে গম্ভীর এই আহ্বান আসে।

না আমি খুলব না, কেউ যদি কড়া ধরে কড়াক্কড় নাড়েও। টেলিফোন তো নেই-ই, কলিং বেল টিপলেও সাড়া দেব না। যদি দরজা ভেঙে ঢোকে, তবু ওরা আমাকে পাবে না, আমি, আমি যেহেতু তখন, কোথায়, খাটের তলায়? কিন্তু নিশ্বাস, নিশ্বাস চেপে থাকব কী করে' একটা হেঁচকি উঠতে পারে, অথবা হাঁচি, কিংবা কিছুকে এখন বিশ্বাস নেই, টিকটিকি ডেকে উঠে আমাকে ধরিয়ে দিতে পারে—সে, আমাদের সে, বলছিল ফিসফিস করে আর ক্রমশ, যেন পিছল পড়ে তুষার ধসে তলিয়ে যাচ্ছিল, ঘুম থেকে ঘুমে। তার স্বপ্নে, স্মৃতিতে।

॥ পাঁচ ॥

আমি এই ভাবে কি তোমাকে ধরতে চাইছি, সময় আমার সময়? জনতা থেকে পালিয়ে চিলেকোঠায়, জাগরণ থেকে পালিয়ে ঘুমে, আবার ঘুমের

চাদরেও ছড়ানো চোরকাঁটা ভয়, তাই আশ্রয় নিয়ে থাকি স্বপ্নে? এ কোথায় এলাম আমি, আবার কি সেই মর্গে? না, মর্গ এটা তো নয়, দেখে শুনে এটাকে একটা ইষ্টিশনই মনে হয়। আমার খুব চেনা সেই রেল ষ্টেশনটা, ঘরে করোগেট টিনের ছাদ থেকে ঝোলানো একটা ঘড়ি বরাবর যেমন, তেমনই পূর্ণিমার মতো। জ্বলজ্বলে হেসে আমাকে ডাকছিল!

বেশ, তবু ঠিক আগেকার মতো মনে হচ্ছে না তো। একটু খাপছাড়া, চারদিকে সেই গমগম ভাব নেই, লোকজন কম, একটা ঠান্ডা ফিসফিস হেমন্তের হিমের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে চুপে চুপে।

তার অবাক লাগছিল। সে কোথায় গিয়েছিল, এখানে এসে নামলই বা কেন।

ফটক পেরিয়ে বাইরে আসতেই কে যেন তার কানে কানে বলল, ম্যাপ চাই ম্যাপ? তার অল্পবয়সে চৌরাস্তার ভিড়ে কোনও কোনও ফড়ে যেভাবে ঘেঁষে এসে চাপা গলায় বলত, প্যারিস পিকচার চাই প্যারিস পিকচার, অর্থাৎ যৌন মিলনের বিবিধ ভঙ্গি ও আসন সচিত্র, সেই ভাবেই এই লোকটা আজ বলছে, ম্যাপ নেবেন না, একটা ম্যাপ?

—ম্যাপ, কিসের ম্যাপ?

—এই শহরের।

—নেব কেন। দরকার হবে না। এখানে আমি নতুন নাকি! কতকাল ধরে এখানে আছি, জানো? এক রকম জন্ম থেকে। এর প্রত্যেকটা পাড়া আমার চেনা, প্রায় প্রত্যেকটা রাস্তাও।

লোকটা ঘনিষ্ঠ কেউ হলে সে যোগ করে দিত "অতি পরিচিত মেয়ের দেহের সব বাঁকের মতন," কিন্তু এই টাউটের সঙ্গে ইয়ার্কি চলে না তাই সে শুধু বলল, এখানে আমার কিছু দরকার হবে না।

—বলা কি যায়? সেই লোকটা কেমন করে যে হাসল! বলা কি যায়! একটু এগিয়ে যান হয়তো দেখবেন, চেনা শহরটা একেবারে অচেনা হয়ে গেছে।

—অসম্ভব! সে বলে উঠল, এই তো নদীটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বরাবর যেমন তামার পাত কিংবা গলানো ইস্পাত, তেমনই আছে।

—ওই নদীটাই আছে।

—আর কিছু নেই, যেখানে যা ছিল?

—অফিস, কাছারি, কোঠাবাড়ি-টাড়িগুলো মোটামুটি দাঁড়িয়ে আছে অবিশ্যি, যেটা যেখানে থাকার কথা সেখানেই। কিন্তু বাইরে থেকে। ভিতরে সব ফোঁপরা হয়ে গেছে। দেখতে অবিকল, ভেতরে বিকল।

—ও। সে বলল, তা হলেও আমি ম্যাপ নেব কেন।

—নেবেন নিজের দরকারে। এই শহরটা সেকটরে-সেকটরে ভাগ হয়ে গেছে। গত লড়াইয়ের পর বার্লিন ভাগ হয়েছিল মোটে চারটে সেকটরে। এখানে আলাদা-আলাদা চৌহদ্দি অন্তত চৌদ্দটি। এক-একটা এলাকা এক-একটা

পারটির আন্ডারে।

সে আবার বলল, ও। সব মিলিয়ে সব এলাকায় ওপরে গবরমেন্ট বলে তবে কিছু নেই?

—আছে। মোগল আমলের শেষ দিকে সারা দেশে যেমন ছিল—নামে। আসলে এক-একটা মুলুক আজাদী পেয়ে গিয়েছিল। এখানেও এখন মহল্লা-ওয়াড়ি দাপট আর শাসন। নিশানও পোঁতা আছে লপ্তে লপ্তে, মাথায় মাথায়। ঢোকার আগে নিশান দেখে নিশানা ঠিক করে নেবেন।

—বা-রে, সে প্রতিবাদ করে উঠল, যাকে একদিন তন্ন তন্ন জেনেছি, যার সাবেকী গলিতে গলিতে ইটে ইটে নোনা গন্ধ বুক ভরে নিয়েছি, খসে পড়া পলেস্তারাকেও ভালবেসে এঁকে নিয়েছি ছবিতে ছবিতে, ভেবেছি নিলেই এই শহর আমার হবে, আজ ইচ্ছেমত তার যেখানে সেখানে যেতে পারব না?

ম্যাপওয়ালা বলল—না। যেখানে-সেখানে কেন, যখন-তখনও না। কখন কোথায় যাওয়া যাবে, কোথায় গেলে ফিরে আসাও সম্ভব হবে, কোন্ সময়টা নিরাপদ, কোন্ এলাকায় বিপদ, সব এই ম্যাপে পাবেন; আর ঘড়ির কাঁটা এঁকে এঁকে দেখানো হয়েছে। নিন, নিন, একটা; দেখে দেখে পথ চলুন, আমাকে আর দেরি করিয়ে দেবেন না।

চিৎকার করে সে বলে উঠতে গেল—"এ জুলুম, তুমি ধোঁকা দিচ্ছ আমাকে—ঠকাচ্ছ। আমি—আমি আদালতে যাব, নালিশ করব।"

সত্যিই সে আদালতে এসেছিল নাকি। বড় বড় বটগাছ, উঁচু-উঁচু থাম, থামের মাথায় মাথায় পিলারের কোণে কোণে ঝটপট পায়রা (ঘুঘু নয়, সে ভালো করে পরখ করে দেখে হৃষ্ট হল)—দেখে শুনে তাই তো মনে হয়। সটান চলে গেল এজলাসে, উকিল-মুহুরি মক্কেল-সাক্ষী আর পানওয়ালাদের ভিড় ঠেলে ঠেলে। ওই তো হাকিম, তিনি সমাসীন মেহগিনি কাঠের ডেসকের আড়ালে, পেসকার-ক্লার্ক ইত্যাদির কয়েক ধাপ উপরে, তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত উচ্চাসনে। আর কাঠগড়াই ওই যে, ওই তো।

সে সম্মোহিত দৃষ্টিতে দেখছিল, কাঠগড়ায় সারি সারি মুখ—কারা? চেনা মুখ চোখে পড়ে কিনা সে মনে মনে আদল মিলিয়ে দেখছিল, আর তখনই—আশ্চর্য কাণ্ড, হাকিমকে যেন হাতছানি দিয়ে তাকেই ডাকতে দেখল।

হাকিম ডাকছেন তাকে? উচ্চাসন থেকে যতটা নীচু হওয়া যায় ততটাই ঝুঁকে পড়ে বলছেন "নিন, সওয়াল সুরু করুন।"

তার বিস্ময় আর অবধি কিংবা বাধা মানছিল না।—সওয়াল করব, আমি? কেন আমি করব কেন। আমি তো দর্শক মাত্র।

—দর্শকরাই সওয়াল করবে। হাকিম গম্ভীর গলায় বললেন, আজকাল এই আদালতে তাই নিয়ম।

আজকাল, এই কথাটায় বুঝি খটকা লাগল তার। এটা কোন্ কাল, জানতে চাইল।

হাকিম বিড়বিড় করে কী একটা বললেন, সে ধরতে পারল না। গলা চড়িয়ে তাকে বলতেই হল—এটা কলকাতা ঊনিশশো একাত্তর তো?

—কলকাতা? হাকিম যেন হাসতে চাইলেন, কিন্তু যেহেতু হাকিমকে হাসতে নেই, তাই হাসির একটা আভা ছড়িয়ে দিলেন মাত্র। কলকাতা' ৭১ নিয়ে সাড়ে চার ভল্যুম ইতিহাস লেখা হচ্ছে—ইনটার-নেশন্স্ ফান্ডের গ্র্যান্ট নিয়ে। সব কমপ্লিট, পণ্ডিতেরা তাঁদের জুনিয়র কোলাবরেটরদের নিয়ে এখন বিশ্রাম নিতে চলে গিয়েছেন আয়োনিয়ান সমুদ্রের ধারে হেল্থ রিসর্ট্এ। লাস্ট চ্যাপ্টারটা লেখাই শুধু বাকী। সেটা এই মামলার রায়ের সংগে মিলিয়ে লেখা হবে। লেখা শেষ হলেই আমরা সাড়ে চার-ভল্যুম আরকাইভ্স আফিসে, মানে মহাফেজখানায় জমা দিয়ে দেব। নিন, নিন, সওয়াল শুরু করুন।

তবু তার যেন প্রত্যয় হল না, সমানে প্রশ্ন করে গেল।—এটা কলকাতা যদি নয়, তবে আমরা আছি কোথায়?

—এই এজলাসটা বসেছে জলের তলায়। কেন, নদীর ধার ধরে আপনি একটু আগে পা টিপে টিপে এগোচ্ছিলেন, তার পর হঠাৎ পিছলে তলিয়ে গেলেন, টের পাননি? সোজা চলে এসেছেন এখানে।

—ভালোই হল, বোকার মতো একগাল হেসে সে বলল, তলিয়ে গিয়ে ভালোই হয়েছে! আমিও একটা সেফ্ জায়গা খুঁজছিলাম, মানে যেখানে নিরাপদ থাকতে পারি। ম্যাপওয়ালা তাই বলে দিয়েছিল।

বলেই তার যেন ফের সংশয় উপস্থিত হল।—কিন্তু, কিন্তু ম্যাপওয়ালা যে বলেছিল শহরটা নানা সেকটরে ভাগ হয়ে আছে, সেটা তবে ঠিক নয়? আপনি, স্যার, হুজুর বলছেন, ভেসে গেছে, ডুবে গেছে?

হাকিম তাঁর ন্যায়দণ্ড ঠক্ঠক্ করে ঠুকে বললেন, "সেটাইতো সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না, সাব্যস্ত হয়নি। প্রথমে ধরে নেওয়া হয়েছিল, ডুবে ডুবে কলকাতা চলে গেছে এস্চুয়ারিতে, মানে মোহানায়, কিন্তু ডুবেও ঠিক ডুবতে পারছে না দেখে খটকা লাগল, কেউ বলল, তলায় চড়ার মতো কী একটা ঠেকছে, আটকাচ্ছে তাতেই। স্পেশালিষ্টরা বললেন নীচের চড়াটা বোধহয় তাম্রলিপ্ত। নষ্ট হয়ে যাবার পর সে-ও হয়তো তলিয়ে তলিয়ে এতদূর চলে এসেছিল, ওয়েট করছিল কলকাতার জন্যে—কেউ টের পায়নি। মানে ওই বিদেশের অ্যাটলান্টিস ইত্যাদি নগরের কাহিনী যেমন পড়েছেন, তেমনি আর কী। কিন্তু বিশেষকদের মধ্যে এ-ব্যাপারে ঐকমত্য হল না, আরকিওলজিষ্ট আর মডার্ণ হিসটোরিয়ানদের মধ্যে লেগে গেল তুমুল ঝগড়া। তখন এলেন যত জিওলজিষ্ট সিস্মোলজিষ্ট, মিটিওরলজিষ্ট অর্থাৎ যত বৈজ্ঞানিক। একদিকে সায়েন্স একদিকে হিউম্যানিটিজ। এখনও এই নিয়ে রিভার রিসার্চ আর মেরিন রিসার্চ

ইনস্‌টিট্যুট মিলে জয়েন্ট একটা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সকলে নিশ্চিত নন। তাই দাবি উঠল, বিচার বিভাগীয় তদন্তই তাই। সব কিছুর সঙ্গে জুরিসপ্রুডেন্স মিলে গিয়ে একটু জটিলতার সৃষ্টি করেছে। তা, মনে হয়, সব সাফ হয়ে যাবে, আমাদের অ্যাওয়ার্ড শেষ পর্যন্ত সবাই মেনে নেবে।

—কী সব আবোল-তাবোল বকছেন আপনি। সে অস্থির হয়ে বলে উঠল—এ-সব কখনকার কথা, এটা কোন্‌ কাল?

সুনিশ্চিত স্বরাঘাতসহকারে হাকিম বললেন, এটা ভাবীকাল। বিচারসভা বসেছে ভাবীকালে।

তার মধ্যে তখন প্রবল প্রতিবাদের ভঙ্গি দেখা দিল। বেঁকে বসে বলল, তবে তো এখানে থাকব না আমি। সময়, আমার সময়কে খুঁজব বলে বেরিয়েছি না? আমি আমার সময়ের কাছে ফিরে যাব।

সে সত্যিই পিছন ফিরে পা বাড়াচ্ছিল, তখন দু'দিক থেকে দু'জন সাক্ষী এসে তাকে আটকে দিল।

মৃদু মৃদু হাস্য করে হাকিম বললেন, উপায় নেই এসেছেন যখন, তখন পালাবার পথ পাবেন না, দায় এড়ানো চলবে না। সওয়াল আপনাকে করতে হবেই। নিন, আরম্ভ করুন, হাতের ভারী দণ্ডটা ঠুকে ঠুকে তিনি বললেন, প্রথমে কয়েকটা পেটি কেস্‌।

সে তখন সেই হলঘরের মাঝখানে গিয়ে ঠিক কৌশুলির কায়দায় দাঁড়াল। গলায় মাপমতো মর্যাদা আর ভারিক্কী ভাব এনে কাঠগড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাদের মধ্যে কারা সাক্ষী, কারা আসামী?

হাকিম ঝুঁকে পড়ে বলে দিলেন, দুই-ই আছে। জেরা করলেই জানতে পারবেন।

সে শুরু করল এইভাবেঃ

—আপনি?

—আমি চাঁদা দিইনি। বলেছিলাম, এখানে গর্ভনমেন্ট নেই? সরকার বাহাদুরকেই তো ট্যাক্স দিই। তোমাদেরও যদি দেব তবে সরকার আছে কী করতে। তর্ক করেছিলাম, ওরা আমাকে তাই—

•—আর আপনি?

—আমিও তাই। দিতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু পাঁচ হাজার—কোথায় পাব। কুড়িয়ে বাড়িয়ে এই মাগগি গণ্ডার দিনে আমার রোজগার ছিল পাঁচ শত।

সে তখন চোখ ঘুরিয়ে হাকিমের দিকে চেয়ে বলল, হুজুর যারা মরেছে

তাদের অ্যাভারেজ ইনকাম কত?

হুজুর বললেন, পাঁচশোর বেশি না। কাঠগড়ার ভিতর থেকে একজন হিংস্র স্বরে বলে উঠল—পাঁচশো? আপনাদের ওই অঙ্ক বুঝি না। আমি প্রাইমারি টিচার, আমার সব মিলিয়ে দেড়শোও হত না। টুইশানি করতাম, কিন্তু ক্লাসই হয় না, শেষে তো স্কুলটাই পুড়ে গেল, টিউটার রাখবে কে!

জোরে জোরে টেবিল চাপড়ে পেসকার বলল, থামুন, থামুন, যা বলছেন, প্রতিবাদ করছেন হুজুরের, এ-সব আদালতের অবমাননা।

প্রগাঢ় জ্ঞানীর মতো মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাকিম বললেন, প্রাইমারী টিচার আপনি? তাই ইকনমিক্স জানেন না। সব মেথড্ সায়েনটিফিক, স্ট্যাটিসটিক্যাল ট্যাবুলেশনের নিয়মেই হল গড়পড়তায় সব বাঁধা। ন্যাশান্যাল প্রোডাকসন, ন্যাশনাল ইনকাম, আমরা সব অ্যাভারেজ-এর টারমস্-এ প্রকাশ করে থাকি।

—ঠিক ঠিক। কাঠগড়ার ভিতরের আর একজন বলে উঠলেন, মার্জিত কণ্ঠস্বর, মিহি-মোলায়েম ভঙ্গি।—ঠিক, ঠিক। আমি একজন কলেজের লেকচারার, আমার ইনকাম ছিল সাড়ে সাতশো। মানে ওই বারো মাসের অ্যাভারেজ মিলিয়ে। টেক্স্ট বুক লিখতাম হেড্ অব্ দি ডিপারটমেন্টের বেনামে। বিনিময়ে তিনি আমাকে একজামিনারও করে দিয়েছিলেন। সত্যি বলতে কী, অ্যাভারেজ এক সময় হাজারও ছাড়িয়েছিল, কিন্তু থাকল না। একটা টেক্স্ট বইয়ে ছবি ছিল কনিষ্কের আর বুঝি হর্ষবর্ধনের, একদিন রেইড্ হল, কোনও বুক-শপ আর তার পরে বইটা রাখতে রাজী হল না।

—কনিষ্ক-হর্ষবর্ধনের অপরাধ কী?

কনিষ্কের মুণ্ডু কাটা, ওরা বলাবলি করল ব্যাপারটা ঠিক নয়, বানানো। বিকৃতি ইতিহাসের। আসলে মূর্তিভাঙার ঘটনা নিয়ে ঠাট্টা।

—আর হর্ষবর্ধনের?

—বোধহয় নামটাই। সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, নামটাই কালপনিক। যে নামের মানে হাসি বাড়ানো, সেটা বানিয়ে নিয়ে কঠিন প্রতিজ্ঞা আর প্রস্তুতিকে আমরা হাসিতে হালকা করে দেবার চক্রান্ত করেছি। যাই হোক, সে-বইটা তো গেল। আর পরীক্ষকের ফী-টাও বন্ধ হয়ে গেল সেই সঙ্গে, কারণ পরীক্ষাই বন্ধ হল যে।

অধ্যাপককে থামিয়ে দিয়ে সে আর একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, চাঁদার কেসগুলো চলছিল, আগে সেটা শেষ করে নিই।—আপনি?

—চাঁদা দিয়েছিলাম আমি। দেওয়াটাই কাল হল। যাদের দিলাম, তাদের বিপক্ষ দল আমাকে মারল। আমি একজন ব্যবসায়ী।

—আপনি আপস করতে চেয়েছিলেন?

—ওভাবে বলছেন কেন। আমি একটা পলিসি কিনতে চেয়েছিলাম—ইনসিওরেনসের।

—তার মানে আত্মরক্ষা, আপন-বাঁচা, এই তো?

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জবাবে কী বলল শোনা গেল না, কারণ তখনই হাকিম হাতুড়ি পিটিয়ে গমগম গলায় বলে উঠলেন 'কোয়েশ্চেন ওভাররুল্ড।"

—আপনি ডাক্তার?

—হ্যাঁ।

—আপনার অপরাধ?

—কল্-এ বেরোতে চাইনি। বোমা বানাতে গিয়ে একটা ছেলের মুখ উড়ে গিয়েছিল, ওরা সেই মুখ জোড়া দিতে বলে' কতকটা সেই আলিবাবার বাবা মুস্তাফার কেস আর কী। আমি বললাম, অসম্ভব। তা-ছাড়া গিয়ে কী হবে। যেতেও মন চাইছিল না, কারণ সেদিনটা ছিল খুব ক্লাউডি। ওই এরিয়াটায় খুব টেনসনও ছিল, গেলাম না, তাই ওরা আমাকে—

—মারল?

—একজ্যাক্টলি। বলল যে, কিন্তু আপনি সব জেনে ফেলেছেন, আর তো আপনাকে বাস করতে দেওয়া যায় না। বললাম, পাড়া ছেড়ে উঠে যাচ্ছি। ওরা শুনল না। একজন বলল, ইউ নো টু মাচ্।' বলেই...আমাকে...শুনেছি পরদিন পাড়ায় বনধ ডাকা হয়েছিল।

—আপনার হত্যার প্রতিবাদে?

—না, না, আমার জন্যে কেন হবে। আমি তো ওষুধের ফ্রিজটার মধ্যে তাল-গোল পাকিয়ে ছিলাম। বোমা বানাতে গিয়ে যার মাথা উড়ে গেছল, সেই ছেলেটার জন্যে।

—আমি মারা পড়লুম কল-এ বেরিয়েছিলাম বলে। আর একজনের গলা, গলায় ঝোলানো রবারের সাপটা দেখে মনে হয়, ইনিও ডাক্তার, বলছিলেন, সেদিনও খুব বিষ্টি। একটা গোলমেলে কেস অ্যাটেন্ড করে, ডেথ্ ন্যাচারাল এই সার্টিফিকেটখানি লিখে দিয়ে ফিরছি, তখন মাঝরাত্তির, ছায়ার মতো একটা ছিনতাই পার্টি বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা ক্যাম্পের লোকেরা। তারা আমাকে তাক করে মারেনি, কিন্তু ক্ল্যাশ্ তো। আমার ছিল রানিং কার, রেড ক্রশ লাগানো অবশ্য, তবু একটা বোমা ছিটকে এসে আমারই বুকে লেগেছিল। জাষ্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। ওরা কিন্তু খুব কনসিডারেট, পরদিন আমারই শোকে সব দোকানপাট বন্ধ করে দিয়েছিল।

—আপনি ফল্স্ ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে ফিরছিলেন? সে কঠিন স্বরে বলল "দ্যাট ওয়াজ ইয়োর ফল্ট্, ইয়োর ক্রাইম।

"রুলড্ আউট, রুলড্ আউট।" হাকিম চেঁচিয়ে বলে উঠলেন।

—আমি কিছু বলব বাবু?

তার হাতে একটা ঘুনটি ঠুনঠুন করছিল বলে, আর ঘুনটিটি সে এখানেও নিয়ে এসেছে তাই বোঝা যাচ্ছিল সে একজন রিকশওয়ালা। সে বলে গেল, যে পাড়াটায় বসতাম আমি, সেখানে এক নাগাড়ে দশদিন বনধ্ গেল। একদিন এনারা ডাকেন, একদিন ওনারা। ডাকলেই সুড়সুড় করে সব বন্ধ হয়ে যায়। রোজই ও-পাড়ায় দু'টো চারটে করে খুন হচ্ছিল কিনা। আমি যে-মোড়টায় বসতাম সেখানে ইট পেতে বসত যে চুল দাড়ি ছাঁটনেওয়ালা, সে বেকার বসে থেকে থেকে একদিন সরে পড়ল। মোড়টা আগে সরগরম করত বাবু। কত বেলুন, বাসন, ফুচকাওয়ালা। সব খাঁ খাঁ করতে থাকল। সন্ধ্যের পর কেউ বেরোয় না। জায়গাটা নিজে-নিজেই কারফু হয়ে যায়। পেট শুকিয়ে মরে যাচ্ছিলাম বাবু, আমার মরার আসল কারণ সেইটাই। নইলে একটা মরা পার করে দেওয়ার সময় যারা আমার পেট ফাঁসিয়ে দিল, তারাই বরং আমাকে বাঁচাল। তাদের ওপর আমার কোনও রাগ নেই।

ভাঙা ভাঙা বাংলায় রিকশওয়ালাটা বলছিল, সে তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল।

—রিকশা তোমার?

—না, আমার মালিকের।

—মালিক এখন কোথায়?

—তাকে ওরা কেউ ধরেনি তো। তার নানা রকম ব্যবসাপাতি ছিল, দিন কতক ওদের টাকা-ঠাকা দিয়ে চালাচ্ছিল, শেষে সব আস্তে আস্তে বেচে ক্যাশ টাকা করে কেটে পড়ল। তার টিকিটিও কেউ ছুঁতে পারেনি।

গলা বাড়িয়ে একজন খুচরো দোকানদার বলল, রিকশাবালা একদম সাচ্চা কথা বলছে মশায়। আমার যারা ছিল পাইকার তাদের কিছু লোকসান গেছে যদিও, তবু কারবার গুটিয়ে সববাই চলে গেছে যার যার মুলুকে—গুজরাট, কচ্ছ, মারবাড়। সেখানে ব্যবসা চালাচ্ছে ফের মনের সুখে।

ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি এক ভদ্রলোক এতক্ষণ পাইপ টানছিলেন অন্যদিকে ফিরে। ফশ করে এদিকে ফিরে বললেন—তার মানে আপনি এক্সপ্লয়টেশনকে ডিফেন্ড করছেন? বলুন, আপনি শোষণ চান?

—আমি কিছু চাইনে বাবু, আমি শুধু বাঁচতে চাই।

ফ্রেঞ্চকাট ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন, ওরা আপনাকেও মেরেছে নাকি?

—আমাকে কেউ মারেনি বাবু, আমাকে মেরেছি আমি। গলায়, পেটে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিলাম।

গোলমাল ক্রমেই বাড়ছিল, গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ছিল গোটা আদালতে। হাকিম কেবলই টেবিল পিটিয়ে বলছিলেন, অর্ডার! অর্ডার! সেই ফ্রেঞ্চকাট্ ব্যক্তিটি, স্পষ্টতই ক্রুদ্ধ, কেমন যেন দাঁত-চাপা স্বরে বলছিলেন, ট্রিভিয়ালিটিজ ইয়োর অনার, এখন যা চলছে সব সুপারফিশিয়াল, ট্রিভিয়াল। টিউটরড্ উইটনেস,

ভিশিয়েটেড্ এভিডেন্স, তা ছাড়া সব ইরেলেভেন্ট। ইয়োর অনার এই পার্টের সবটা এক্স্পান্জ করে দিন এই লোকগুলো এখন যা বলছে, ওদের দিয়ে বলানো হচ্ছে, তা দিয়ে খবরের কাগজের রাবিশ লেখাগুলোই তৈরী হয়—রদ্দি সম্পাদকীয় যত, দোজ্ মিসলীডিং লীডারস।

সঙ্গে সঙ্গে বিচার সভায় সমস্বরে অনেকে বলে উঠল, কী বলছে লোকটা, লীডার? আরে, ওই তো ছিল আমাদের লীডার। ওই তো, আমাদের লীডার, ওই তো ওই তো।

গোলমাল ক্রমে ছড়াচ্ছিল। একজনের গলা শোনা যাচ্ছিল—ওই তো, ওই তো। ওই আমাদের খ্যাপাত, বলত দালালদের হালাল করো, শোষণের খতম চাই, শ্লোগান আরও কত কী। ওর কাছ থেকেই রোজ নির্দেশ নিয়ে আসতাম, ওর বালিগন্জ প্লেসের বড় বাড়িটার ফটক আমার জন্যে খোলাই থাকত সর্বক্ষণ। ও বলত, চালাও, চালাও। চালাতে চালাতে কারখানাটাই একদিন বন্ধ হয়ে গেল। ওরা লীড্ করে আমাদের একদিন রাজভবনে নিয়ে গেল, আর একদিন রাইটাস বিলডিং। জোর বিক্ষোভ দুদিন দেখানো হল, যদিও ছিল তুমুল বিষ্টি। শুনেছি তখন আমাদের স্মারক লিপি নিয়ে ও রাজ্যপালের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিল।

—আর একজন লীডার তখন শুনেছি কফি খাচ্ছিল কফি হাউসে। অন্য একজন সোডা আর ব্রানডি নিয়ে অ্যামবারে। পিছন থেকে অন্য একজন ফোড়ন কেটে বলল।

রাগে গাঁ-গাঁ করতে করতে ফ্রেঞ্চকাট্ বলল, বেশ করেছি, আমরা কোনও অষ্টিয়ারিটির ভড়ং তো রাখিনি, তোমাদের গান্ধীওয়ালাদের মতো। কংগ্রেসীরাও ঢুকুঢুকু ঢালে, সিংকিং সিংকিং স্ট্রং ড্রিংক খায়।

পিছন থেকে চেঁচিয়ে সে বলল, ওই এক কায়দা ওদের। নিজেরটা ঢাকা দিতে টেনে আনে আর একজনের অন্যায়। বাপু হে, একটা দোষের দোহাই পেড়ে কি আর একটার সাফাই হয়?

—বুরজোয়া যুক্তি, বস্তাপচা সব আরগুমেন্ট। ফ্রেঞ্চকাট গোঁ-গোঁ করতে করতে বলল। আর প্রথম বক্তা তখন তার পুরনো কাহিনীর খেই ধরল এইভাবেঃ

—আস্তে আস্তে বিক্ষোভ দেখানো থেমে এল। সবাই পড়লাম এদিক ওদিক ছিটকে। দেহাতী-দেশোয়ালী লেবার যা ছিল সব চলে গেল বিহারে, ইউপিতে গেঁহু আর অড়হরের ক্ষেতে। পড়ে রইলাম আমরা ক'জন, যারা ধুতি পাঞ্জাবি পরি কিংবা জিনের প্যান্টে সার্ট গুজে অফিসে যাই। কারখানা বন্ধ, ডিরেকটার বোর্ড নতুন লাইসেন্স্ বের করে নিয়ে মাইসোরে প্ল্যানট খুলল। ডিরেকটিভ নিতে দৌড়লাম ওই লীডারের বাড়ি। দেখি, সে-দরজাও বন্ধ, বরাবর আমার জন্যে যেটা হাট করা থাকত। খবর পাঠালাম, শুনলাম দেখা হবে না। দ্বিতীয় দিনও তাই। তৃতীয় দিন লোকটা, ওই লীডারটা, আমার দিকে কুকুর লেলিয়ে দিল।

—কামড়ায়নি তো?

—না। কিন্তু কামড়েছিল সত্য কথাটা, যেটা তখন বুঝেছিলাম। কারখানাটা ছিল বলেই ওর কাছে আমার দাম ছিল, কারণ আমিও ছিলাম ছোট খাটো নেতা, কাজ হাসিলের হাতিয়ার। কারখানাই যদি বন্ধ হল, ওর কাছে আমার দরকারও ফুরোলো। ছিবড়ে হয়ে গেলাম একেবারে। আমাকে দিয়ে কী করবে তখন ও, কুকুর লেলিয়ে দেবে না তো?

টক্‌টকে চোখে ওর দিকে চেয়ে ফ্রেঞ্চকাট্‌ বলল, তার মানে শোষণের উচ্ছেদ চাও না তুমি? দা—লা—লি!

—শোষণের উচ্ছেদ চাই বৈকি, কিন্তু আসল জিনিসটারও যদি উচ্ছেদ হয়ে যায়, তবে তো সবটাই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। সোনার ডিম চাই বৈকি, কিন্তু হাঁসটাকে বাঁচিয়ে রেখে। তা-ছাড়া, আমাদের ওখানে শোষণের উচ্ছেদ হল কি? সুপারভাইজারি স্টাফ চলে গেল মাইসোরে, আর এক দল, আগেই তো বললাম, দেহাতের অড়হড়ের খেতে, একা আমরাই না পড়ে রইলাম, পুরো শোষিত, নিঃশেষিত একেবারে? আর দালালি? কথাটা আর বলবেন না। তারও রকমফের জানি। আমাদের রাইভ্যাল কোমপানির মালিকদের টাকা আপনারা খাননি? আমাদের বলতেন লড়ে যাও, চালিয়ে যাও। বলতেন, কলকাতা ছেড়ে ব্যাটারা যাবে কোথায়। ব্যাটারা গেল কিন্তু, থাকল না। খালি দেখছি কলকাতাই থাকল না কলকাতাতে। সব চলে যাচ্ছে, কানপুরে, মাইসোরে, মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে।

ক্রুদ্ধ ফ্রেঞ্চকাট্‌ হাকিমের দিকে তাকিয়ে বলল, পয়েন্‌ট্‌, অব্‌ অনার, মী-লর্ড। এই ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল লোকটা খালি আজেবাজে কথা বলছে, অন্য প্রদেশের তুলনা টেনে আনছে।

মনোযোগ দিয়ে সে এতক্ষণ তর্ক শুনছিল দু'জনের। এবার এগিয়ে এসে বিনয়ী ভাবে বলল, কেন, তুলনা চলবে না বুঝি? মাইসোর মহারাষ্ট্রে বুঝি শোষণ-টোষণ একেবারে নেই, তাই একটানা প্রোগ্রেস চলছে অন্য সবখানে?

ফ্রেঞ্চকাট্‌ দৃষ্টি দিয়ে যেন দগ্ধ করতে চাইল ওকে। বলল, অশিক্ষিতের মতো কথা বলছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গলের সোসিও-ইক্‌নমিক পটভূমি কী, দেখতে হবে না? ব্যাখ্যা অতো চাট্টিখানি নাকি?

সে বলল, বুঝেছি। ল্যান্‌ড সিস্‌টেম, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, এইসব টেনে আনবেন তো? সব সত্ত্বেও কিন্তু একদিন এখানেও প্রোগ্রেস হয়েছিল, আদার থিংস রিমেইনিং দি সেম্‌। তার ব্যাখ্যা? সেই সিক্সটিজ থেকে সর্বৈব যে পতন এসেছে, সব কিছু ধসে পড়া, এতটা কি আগে ছিল? মহাশয়, ব্যাখ্যাটা সোসিও ইকনমিক নয়, পলিটিক্যাল, যার নিরঙ্কুশ ব্যবহার স্টেটটাকে একেবারে ভাগাড়ে টেনে এনেছে। বলছেন সোসিও-ইক্‌নমিক পটভূমি? তা হলে লর্ড কর্ণওয়ালিসেই বা থামছেন কেন? থামছেন কেন। চলে যান না একেবারে ক্লাইভ অবধি—ব্যাট্‌ল অব্‌ প্ল্যাসী। কিংবা বখতিয়ার খিলজির আক্রমণ, লক্ষণ সেনের

পলায়ন, যতদূর ইচ্ছে পিছিয়ে চরে বেড়ান। সামাজিক ব্যাপারে বল্লালী বন্দোবস্তও টানতে পারেন, তাতে খুব এলেমবাজি হবে বটে, কিন্তু হালফিল বেহাল দশার কোনও ফয়সালা পাবেন না। চান বা না চান, তাকাতেই হবে মহারাষ্ট্রের দিকে, গুজরাটের দিকে, হরিয়ানা, পাঞ্জাবে—

ফ্রেঞ্চকাট বলল, আগেই বলেছি তো, ও-সব তুলনা খাটে না।

—খাটে না? অথচ নজির খাটে খালি চীনের, কিংবা কিউবার? চমৎকার যুক্তি তো, আপনার পুঁথিতে বুঝি লেখা আছে? ওরা সব দূর দূর দেশ, ওদেরও কিন্তু আলাদা আলাদা সোসিয়ো-ইকনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড। তবু ওদের তুলনা খাটবে অথচ খাটবে না সেই সব এলাকার যারা পুরোপুরি আমাদের মতো না হোক, আফটার অল্ একই স্বদেশের অংশ, অনেকটাই একই ভূগোল ইতিহাসের হিস্যাদার!

থমথমে মুখে ফ্রেঞ্চকাট্ বলল, আপনি খালিখালি রুশ-চীন ইত্যাদির কথা তুলে খোঁচা দিচ্ছেন। ওদের অ্যানালজি কেন খাটবে না। আপনি য়ুনিভার্সালিটি অব্ রিভোলুশনের তত্ত্ব জানেন না?

—য়ুনিভারসালিটি? সেই বিশ্ববৈপ্লবিক তত্ত্ব তো, যা দিয়ে রাশিয়া আজ খাঁটি একটি ন্যাশান্যল স্টেট হয়েছে, চীনও হচ্ছে ক্রমে ক্রমে? বুঝেছি—সে মুখ টিপে বলল, আর বলতে হবে না।

ফ্রেঞ্চকাট সে-কথা হয়তো শুনল না, বলে গেল, আর আপনি মাইসোর টাইসোরের কথা যা বলছিলেন সব বাজে। ও সব দু-দিনের ব্যাপার। ওদের কলকাতায় ফিরে আসতেই হবে। কলকাতা—দি নার্সারি অব এভ্রি রিভোলুশনারি স্পিরিট, কালচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার।

সে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, জোর করে তা-ও কিন্তু বলা যায় না। পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে কেউ টের পায় না এই তার শেষ। ভাবে আবার হয়ত উঠবে। একটা নগরীর, একটা জাতির অবক্ষয়ের মুহূর্তেও তেমনই। গ্রীসের জীবনে এসেছিল, আপনি এলেমদার, আপনার নিশ্চয় অবিদিত নেই সেই কাহিনী? কী ভাবত সেদিনের গোধূলিতে এথেনিয়ানরা? বুঝেছিল কি যে অদ্যাই শেষ রজনী? হয়তো না। আশা করেছিল নিশ্চয় যে ভোর হবে? কিন্তু সেই ভোর আর আসেনি। গ্রীকরা পরে বড় জোর রোমকদের মুলুকে করেছে মাস্টারি, কিন্তু পরবর্তী গ্রীকদের দুনিয়ার আর বিশেষ দরকার হয়নি। আজও হয় না, খালি ক্লাসিক্স আর ইতিহাসে কৃতবিদ্য হবার প্রয়োজন ছাড়া। এই পৃথিবী বহুকাল প্যারিস-লনডন-ভিয়েনা-বার্লিন, পরে মস্কো নিউইয়র্ককে নিয়েই দিব্য অহংকৃত আছে, এথেন্সকে তার আর দরকার হয়নি।

একটানা বলে সে নিজেও হাঁপাছিল, হাকিমই বাঁচিয়ে দিলেন তাকে। টেবিল বাজিয়ে বলে উঠলেন, বাঁধা চৌহদ্দির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এখন থাক, পরে হবে। দি কোর্ট স্ট্যান্ডস্ অ্যাডজরনড্ ফর হাফ অ্যান আওয়ার। ইচ্ছে হয় তো আপনি ফের শুরু করবেন তার পরে।

সে বেরিয়ে এল বাইরে। কিছু সাক্ষীসাবুদ তখনও ছড়িয়েছিল আদালতের চত্বরে। তাকে দেখে একজন এগিয়ে এসে বলল, আমার কথাটা আজও বোধহয় রেকর্ডেড হল না, যা একখানা লম্বা লেকচার ঝাড়লেন আপনি।

—আপনি কে?

—আমি একজন আভিধানিক, মানে ডিকসনারি সম্পাদন করি আর কী। নতুন সংস্করণে কয়েকটা নতুন মানে জুড়ে দিয়েছিলাম, যেমন সন্ত্রাস মানে ভীরুতাও হয়, শ্রেণী সংগ্রাম মানে গুপ্তহত্যা—এই সব। অর্থাৎ এক-একটা অর্থ কোথায় নেমে এসেছে। আরও কয়েকটা সংযোজনের ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু সে সময় আর পেলাম না, তার আগেই আমার বউকে বিধবা হতে হল।

তার পিছনে দেখা দিল আর এক একটা মুখ, সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধের। —আমি মহাভারতের একটা সংশোধিত, রূপান্তর বের করেছিলাম, তাতে মুষলপর্ব—ইত্যাদি ঘটনা নিয়ে এসেছিলাম উপরের দিকে, কী পাগলামি বলুন তো! তাতে যাদবদের ট্রাজেডিকে বড় করে দেখিয়ে ছিলাম, পান্ডবদের কাহিনীর ঢের ওপরে। সেই যে আছে না, কৃষ্ণ-পিঙ্গলবর্ণ মুন্ডিত এক কালপুরুষ ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন......মুষিকের দল ঘুমন্ত যাদবদের নখ ও কেশ ছেদন করতে লাগল...গাভীর গর্ভে গর্দভ, অশ্বতরীর গর্ভে হস্তিশাবক, কুক্কুরীর গর্ভে বিড়াল এবং নকুলীর গর্ভে মূষিক উৎপন্ন হল? কৃষ্ণ একদিন যাদবগণকে বললেন 'আমাদের বিনাশ আসন্ন হয়েছে, তোমরা সমুদ্রতীরস্থ প্রভাসতীর্থে যাও'—চমৎকার মিলে যাচ্ছে না? আপনি এথেন্সের নজির টেনেছিলেন, কিন্তু দ্বারকা আরও কাছের, আমাদের পক্ষে আরও প্রাসঙ্গিক।

—তারপর কী হল?

—সংশোধিত ভাষ্য ছেপেছিলাম বলে ওদের একদল আমাকে শোধনবাদী বলল। সেই শোধনবাদের দায়ে গণ আদালতে......

সে বলল, ঠিকই করেছে। আপনি নিজে বিচার না করে কৃষ্ণবাক্যকেই অন্ধভাবে বিশ্বাস করেছিলেন, এটা শাস্তি তার। দেখুন আমাদের মিথ্যে অনেক, তার মধ্যে একটা বড় মিথ্যে শ্রীভগবানের মুখে বসানো 'সম্ভবামি যুগে যুগে' এই অঙ্গীকার। কৃষ্ণ যখন ব্যাধের বানে বিদ্ধ হয়ে সমুদ্রোপকূলে; নিশ্চিত মৃত্যু এগিয়ে আসছে কলকল স্বরে, তখন কোথায় ছিল তাঁর দুষ্কৃত-বিনাশের অহংকার? মহাপুরুষদের শ্রদ্ধা করব, কিন্তু একান্ত তাঁদের ওপরই সব ভরসা রাখবেন না। মহাপুরুষ বা অবতারেরাও অসহায়—তাঁরাও কখনও কখনও একা হয়ে যান। ধরুন যীশু। তিনি নাকি আমাদের সকলের পাপের ভার মাথায় নিয়েছিলেন। নিতে পারেন, কিন্তু ক্রুশ বহন করেছিলেন তিনি একা। মৃত্যুযন্ত্রণা—সেও তাঁর একার।

বিশ্বাসী বৃদ্ধ বললেন, লোকে তবে দীক্ষা নেয় কেন?

—চালাকি, স্রেফ চালাকি। শস্তায় মোক্ষ কিনতে, অন্যের উপর বরাত দিতে। ভিতরে কৃতকর্মের যে জগৎ আছে, ময়লা জঞ্জালের একটা পাহাড়, তা কোথাও

ঢেলে দিয়ে, জমা দিয়ে রেহাই পেতে। গরু হল সেই ডাম্পিং গ্রাউন্ড, আমাদের পাপবোধের ধাপা। যীশুর উপরও তেমনি। সব ভার তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে যুগে যুগে যত যাজক তার শাসকের দল হাঁপ ছেড়েছে। ওটা বুজরুকি।

বৃদ্ধকে গদ্‌গদ্ চোখে চেয়ে থাকতে দেখে সে বলল, উঁহু, আমাকে ছদ্মবেশী মহাজ্ঞানী-টানী ঠাউরে বসবেন না। বলে, বৃদ্ধের পিঠ চাপড়ে দিল।—ঘাবড়াবেন না শোধনবাদী বলেছে বলে। ওই ছাপে সবাইকেই দাগ দেওয়া যায়। স্মরণ করুন, স্বয়ং মাও ছাপ্পান্ন সনের সেপটেম্বরে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্কের কথা বলেছেন, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতির কথা উচ্চারণ করেছেন সাতান্ন সালে, এমন কি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গেও ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধের সম্ভাবনা ঠেকানোর চেষ্টা যে কর্তব্য, সেটা খোলাখুলি মুখে আনতে দ্বিধা করেননি—সেই সংকল্পেরই বাস্তব চেহারা এখন দেখা যাচ্ছে। আর মশাই সব চেয়ে পিলে-চমকানো শোধনের পাট তো চলে গেছে মারক্সের ওপর দিয়েই, ডিকটেটরশিপ অব্ দি প্রলেতারিয়েত—যেখানে সর্বহারারাজ স্থাপিত হওয়ার কথা, সেখানে জবরদস্ত এক-নায়ক মহানায়ক কী করে কায়েম হল সর্বহারাদেরই ঘাড়ে? কোনও তাত্ত্বিক এই পঞ্চগব্যে শোধনের ব্যাখ্যা দেননি।

কাঁপা কাঁপা গলায় বৃদ্ধ বললেন, বলুন তো আপনি কে? শুনে কতক্ষণ যে সে স্থির হয়ে রইল। কপালটা ফোলাই ছিল, এবার ওই কপালে সে নির্ঘাৎ শিবনেত্র ফোটাবে, ধক্‌ধক্ আগুন জ্বলবে, ববর্‌ববম্ বাদ্য বাজবে গালে! সে-সব কিছুই ঘটল না, সে সলজ্জ হেসে সরে এল।

॥ ছয় ॥

—অর্ডার, অর্ডার। হাকিম বলছিলেন হাতুড়ি বাজিয়ে বাজিয়ে। দেখুন, এবার কিন্তু তাড়াতাড়ি সারবেন। আর কাউকে ব্যক্তিগত সেণ্টিমেনটে ঘা দিয়ে কিছু বলবেন না।

নড্ করে সে দাঁড়াল আবার ঘরের মাঝখানে আর এদিক-ওদিক তাকিয়ে মনে মনে বলতে থাকল, বিনীতা, বিনীতা, আমার বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। কতক্ষণে ছাড়া পাব জানি না। কতদূর চলে এসেছি আমি, ঠাহর নেই, এরাও কিছু বলতে পারে না। স্রোতের ভাটিতে আছি, সময়েরও ভাটিতে আছি হয়তো-বা, কিন্তু আমাকে ফিরতে হবে, উজান ঠেলে ঠেলে, স্রোতের বিরুদ্ধে, সময়ের বিরুদ্ধে—কেননা সেখানেই আমার আসল বোঝাপড়া। ফিরতে আমাকে হবেই। সেখানে, যেহেতু, অপেক্ষা করে আছ তুমি, আমার এই কম্পিত কালের শেষ আশ্রয়।

বিনীতা, গিয়ে যেন দেখি তুমি ফিরে এসেছ, সুস্থ, সারা দিনের শ্রমের ক্লান্তি ধুয়ে টাটকা-মাড়ের গন্ধ ছড়ানো তাঁতের শাড়িটি পরে আছ তুমি সুন্দর করে।

আমরা নির্ভয়ে বসব কি সেখানে, বাইরের কোনও বিকট আওয়াজ শার্সির মসৃণতাকে খানখান করে দেবে না? তোমার কপালের রক্ত-টিপটা দীপ্তি দিতে থাকবে, নতুবা আর কোনও আলোর দরকার হবে না। অতো বড়ো আকাশটাকে ফুটিয়ে রাখতে কোন-কোনও ভোরে মনে হয় একটা শুকতারাই যথেষ্ট। তোমার মনে হয় না?

এই সব সুন্দর রচনার জন্যেই তো আমার সংগ্রাম, বিনীতা। অথচ কারা যেন এই ভোরে ওঠাটাকেই বলছে ভাব-বিলাস, বলছে অবক্ষয়। ভেবে দ্যাখো তো, অর্থের কী দারুণ বিপর্যয়। মানবিক কতগুলো মৌল স্পৃহা, আবেগ, বাসনা অনীহাকে ওরা অস্বীকার করে বলেই তো মানবতারই একটা বৃহৎ ভাগের সঙ্গে ওদের সংঘাত লাগে; সমাজের সন্ত্রস্ত অসম্মত একটা অংশ প্রতিবাদে সংহত হয়, যেখানে শক্তি বেশি সেখানে ওদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভিতরের প্রত্যাখ্যান রূপ ধরে বাইরের রূঢ় আঘাতের। যেখানে আবার ওদের জোর বেশি, সেখানে ওরাই জোর করে চাপায়, দাবায়, ফাঁসীর আসামীর মুখ যেমন চিরতরে একটা কালো কাপড়ের ঠুলিতে ঢেকে দেয়।

একটা মহৎ লক্ষ্যের পথ আর পদ্ধতি অসহিষ্ণু ঘৃণ্য হতে পারে না, সেই জন্যে প্রশ্ন উঠছে বারবার, সংঘাত ফেনিয়ে উঠছে, এতদিন ধরে এত রক্ত ঝরেও সংশয়কে ধুয়ে সাফ করতে পারেনি। গ্রহণ নেই, বড় জোর আছে মেনে নেওয়া। তার হেতু, ওদের পথ মানুষের সব উপাদানকে স্বীকার করেনি, আবিষ্কার করেনি কোথায় সাংস্কৃতিক সঞ্জীবনী। ফলে বিজ্ঞানে বা বৈষয়িক কল্যাণে যাই ঘটুক ওদের ফরমানের ফর্মাবাঁধা মননশীল যত সৃষ্টিপ্রয়াস, তা বহুলাংশে ব্যর্থতার ইতিহাস। শুধু রুটিতে নয়—আবার রুটি বিনেও নয়, এই দুটোকে মেলানো দরকার। সেই সমঝোতা উপেক্ষিত বিস্মৃত দশায় এখনও অপেক্ষায় আছে। পেটের সঙ্গে মনও ভরাতে হবে।

মানুষ তার মূল মহত্ত্ব আর পল্লবিত দুর্বলতা দুই নিয়েই। এখনও তাই। উত্তরণের সাধনা হয়তো চলছে। কিন্তু তার শারীরিক মাপজোপের মতো তার মানসিক ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, লোভ, ইচ্ছা, ঈর্ষা ইত্যাদির সীমা? যারা পার হতে পারল না—অনেকেই পারেনি—তারা কি সহানুভূতি, সাহায্য এমন কি করুণারও যোগ্য বিবেচিত হবে না? নির্মমতাই তাদের সম্পর্কে একমাত্র নির্দেশ, অনুত্তরণের অপরাধের উত্তর?

এই জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসাটা খালি কায়েমী স্বার্থের অছিদের ঘাটি থেকে ওঠে না, সামান্য সাধারণের মধ্যেও জাগে। এটাও সত্য। এই সত্যটা ওদের স্বীকার করে নিতে হবে। জিজ্ঞাসা জাগে কেন, সৎভাবে সে-কথা নিজেদেরই জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে। জানতে হবে আচার-বিচার-আচরণে শুষ্ক নিষ্ঠুরতাই দ্বিধা সৃষ্টি করে কিনা। সবলতার আস্ফালনের মধ্যেই দুর্বলতার কোনও নিশ্চিত বীজ নিহিত আছে কিনা। নতুবা প্রশ্ন নিরস্ত হবে না। নিরস্ত যদি বা হয়, তবে একমাত্র জবরদস্তিতে। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া কোথাও আবার অন্য

পক্ষকেও আরও অসহিষ্ণু, অনাচারী করে তোলে। পালটা ফাশিস্ত শক্তি বা মতিগতির অভ্যুদয়—ইতিহাসে তার বিস্তর নমুনা আছে। সেই রাস্তা হনন, প্রতি-হননের। সেই রক্তাক্ত রাস্তাটা কোথাও গিয়ে শেষ হয় না কিন্তু! বরং ঘড়ির কাঁটার মতো আবৃত্ত হতে থাকে। মাঝখান থেকে মারা পড়ে মানুষ—সাধারণ মানুষ। কোনও দিকেই যারা সায় দিতে পারে না, সামিল হতে চায় না, সেই উলুখাগড়ারা। আমি ওদের কোনটার মতো হই না, যেহেতু আমি আমার মতো। ইচ্ছে হলে হয়তো ওদের মতো হতে পারি' কিন্তু ওদের মতো একবার হলে তো আমি আর আমার মতো হতে পারব না!

মানুষের জন্যে, আমার তো মনে হয়, উদার মানবিকতার চেয়ে মহত্তর কোনও মত ও পথের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি। সেটাও সম্পূর্ণ-পরিপূর্ণ কিছু নয়। শেষ নয়, কিন্তু এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ।

একা-একা কথা বলছি? ওই আমার দোষ বিনীতা, একা-বলি। একার মতো করে বলি। আমি কেন, আরও অনেকেই এমনই একা। তাতে লজ্জা নেই। জগতে এ-যাবৎ স্পষ্ট কথা জত কন বলেছে, তাদের সঙ্গে সেই ক্ষণে গলা মিলিয়েছে কত জন, সায় দিতে হাত তুলেছে? পাশেও তৎক্ষণাৎ বেশি কেউ দাঁড়ায়নি। এ এমন একটা নিঃসঙ্গ নিভৃত ব্যাপার, নিজের মনকে নিজে উন্মোচন-উচ্চারণ যে, প্রায় কেউই শোনে না। এ-জিনিস সংসদে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত কোনও প্রস্তাব নয়, তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে পাশ হয় না।

বিনীতা, কাঠগড়ার ভিড়ের মধ্যে ওই একটু নুয়ে-পড়া, অস্থির উপরেই চর্ম-আঁটা মাঝবয়সী লোকটা কে? দাঁড়াও, আমি জেনে নিচ্ছি।

—আপনি?

—এখনও জবানবন্দী? আর কত কষ্ট দেবেন আপনারা? আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয় ঠিক আমার বয়স যখন বিয়াল্লিশ। হাত পুড়িয়ে রান্না, ছেলেকে নাওয়ানো খাওয়ানো—সে এক কষ্টের সময় গেছে, কারণ ছেলের মুখ চেয়েই আমি আর বিয়ে করলাম না। ছেলে বড় হল ধীরে ধীরে। দেখলাম, লেখাপড়ায় ভালো। আশা হল, আমি যা হতে পারিনি ও হয়তো তা হবে। ওকে দিয়েই আমার অপূর্ণ ইচ্ছে মিটবে।

—তারপর?

—তারপর কবে থেকে যেন ও বদলাতে থাকল। না, শুধু চেহারায় নয়, চেহারা তো বদলাবেই, ও বদলে যেতে থাকল ধরন-ধারণে। মুখে কিছু বলত না, কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হত ওকে আমি ঠিক চিনি না। একলা ঘরে তখনও পড়াশোনা করে কিন্তু টের পেতাম, সর্বদাই ও এমন কিছু বই পড়ছে না। আরো কী যেন করে—আঁকে, লেখে। আমার পায়ের শব্দ পেলে তাড়াতাড়ি সব লুকিয়ে রাখে। কারা সব ওর কাছে আসে, ফিসফাস কথা বলে, ও পিছু

পিছু বেরিয়ে যায়, আবার হঠাৎ আসে, উদাস দৃষ্টি, যেন দেখেও দেখছে না, মুখে গ্রাস তুলছে কিন্তু খাচ্ছে না। ওদের ক্লাসটীচার একদিন এসে আমাকে কী সব বলে সাবধান করে দিয়ে গেল। ভালো বুঝলাম না। ওর খোঁজে একটা লোক এল একদিন, ও বাড়ি ছিল না। সেদিন ফিরল অনেক রাতে। ওকে বললাম। ও ভাঙা স্বরে বলল 'তাই বুঝি? বলে, জানালার বাইরে উঁকি দিয়ে দেখল। দেখলাম আমিও। সেই লোকটা। যেন নজর রাখছে। সেই দিনই শেষ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে ওকে আর দেখতে পেলাম না। পরপর আট-দশ দিন ও ছিল না। ইতিমধ্যে কৃষ্ণা একাদশী অমাবস্যা পেরিয়ে শুক্লপক্ষ—আমার বাসাটা ছিল শহরতলীতে, নারকেল গাছ, সামনের খানিকটা ঘাস বেড়ার কোণে একটা বেলফুলের ঝাড়—ওখানে চাঁদের আলোর জোয়ার ভাঁটা চোখে পড়ত।

—বলুন, তারপর? ছেলে ফিরেছিল?

—ফিরেছিল। সেদিন বোধহয় পঞ্চমী কি ষষ্ঠী তিথি। ঘুম নেই, জানালায় দাঁড়িয়ে আছি। ভাসা-ভাসা আলোয় ওকে দেখতে পেলাম, গেট ঠেলে চুপে চুপে ঢুকছে। ওর সঙ্গী কয়েকটা ছায়া অন্য দিকে সরে গেল। ওর চোখ চকচক করছে, ওর হাতেও কী একটা চকচকে। তার খানিকটা ভাগে রক্ত মাখানো। তখনও দু চার ফোঁটা ঝরছিল। চাঁদের আলোয় নুয়ে পড়ে দেখলাম, ও বাড়ির সামনের ঘাসে ছুরিটা ঘষে ঘষে মুছে নিল। মুছলই শুধু, কতক্ষণ ধরে যে মুছতেই থাকল! শেষে, একসময় উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলল।

—তারপর?

—দরজা খোলাই ছিল। অন্ধকারে আমি ওর সামনে দাঁড়ালাম। বললাম কী করে এসেছিস তুই? ও চাপা গলায় সোজা জবাব দিল, 'খতম করে এসেছি।' চাপা গলা এত ভয়ানক হয়, জানতাম না। কাঁপা গলায় বললাম, 'সর্বনাশ! কাকে?' সে বলল 'মানুষের শত্রুকে।' তবু বললাম 'কিন্তু সে-ও মানুষ তো?' ও উত্তর দিল 'অমানুষ।' তখন আমিও না-ছোড়, তর্ক করে চলেছি—'একটা মানুষকে শেষ করার সময় তোর হাত কাঁপল না?' সে জবাব দিল "না। জগতের যত অত্যাচারিত মানুষের কথা মনে এনে, তাদের প্রতি ভালবাসায় তখন বুকটা ভরে তুলে নিলাম যে। সৈনিকেরা যা করে। তারাও মানুষ মারে, দেশের নামে। কই, তাদের উদ্দেশে তো তোমরা নীতিবাক্য কপচাও না।" তর্ক বৃথা, তাই বললাম "সে যাক। যাকে আজ মারলি, সে অমানুষ কিসে?" ছেলে খেঁকিয়ে উঠল। 'সে তুমি বুঝবে না।" ওর গলা খড়খড়ে, আমার সঙ্গে এত বিশ্রী গলায় ও কখনও কথা বলেনি। ওর হাতে রক্ত—তো দেখেছিলামই—তখন দেখলাম, রক্ত ওর চোখেও। টক্‌টক্ করছে, যেন ফেটে পড়বে। আমি ওর চোখের দিকে চাইতে পারছিলাম না, যদিও খুব তেজী, খুব স্পষ্ট গলায় ও বলছিল, 'কাদের মারছি জানো? যারা দালাল, ব্যবসাদার, সরকারের কুকুর ভুয়ো

বিদ্যে-বেচার ইজারাদার, কোন-না-কোন ভাবে এই পচাগলা সমাজের পোষাক, কিংবা শ্রেণীস্বার্থের বাহক, কিংবা কোন-না-কোন ভাবে উপস্বত্বভোগী— আমিও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলতে গেলাম, কিন্তু পারলাম না, বুকের ভিতর ধাঁ করে যেন একটা ঘণ্টার ঘা পড়ে গেল, চমকে ভাবলাম, সমাজের উপস্বত্ব-ভোগী তো আমিও, এই ব্যবস্থার উঞ্ছ কুড়িয়ে খোরাক রোজগার করছি। চোখ ফিরিয়ে নিলাম অন্যদিকে, শুয়ে পড়লাম। আড় চোখে চেয়ে দেখি, ও-ও জামা ছেড়ে শুয়ে পড়েছে, ওদিকের খাটটাতে। মা-মরা ছেলে, আগে আমার সঙ্গে এক বিছানাতেই শুতো, এই সবে বছর দুই হল অন্য খাটে। আমার পলক পড়ছে না, আমি চেয়ে আছি। ঘুমোতে পারছি না—ভয়ে।

—ভয়ে?

—ভয়ই তো। শ্রেণীস্বার্থের পোষক, পেটোয়া এসব কথা মাথায় ঢুকছিল না, কিন্তু তখন থেকে একটা কথা কামড়াচ্ছে খালি—উপস্বত্বভোগী। আমিও তো তাই, একই অপরাধে অপরাধী। তবে আমাকেও ও মনে মনে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে রেখেছে নাকি? মারবে, আমাকে? কখন, যেই ঘুমিয়ে পড়ব, তখন? চোখ বুজলেই চোখ দুটো একেবারে বুজিয়ে দেবে? ঘুম আসছিল না, উঠে জল খাচ্ছিলাম চুপে চুপে, একটু শব্দও যেন না হয়। ওকি ঘুমিয়ে পড়েছে? না, ঘুমোয়নি তো, ও ঘুমোলে আমি বুঝতে পারি, ওর বুক তখন মিনিটে কতবার ওঠানামা করে, গুনে গুনে জানি। ঘুমোয়নি, তা হলে অপেক্ষায় আছে। তাকাতে পারছিলাম না, তাই পাশ ফিরে শুলাম, দেওয়ালের দিকে মুখ করে। কিন্তু টের পাচ্ছি, শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে, এখনই যদি উঠে আসে, যদি পিঠে ছুরি বিঁধিয়ে দেয়? ওদিকে দাঁড়িয়ে, খাটের ওপর নুয়ে পড়ে—ও নিজে শুতো, সেদিন পর্যন্ত খাটের যে দিকটায়। মারুক, ও আমাকে মারুক, আস্তে আস্তে আমার ভয় কেটে গেল, নিশ্বাস চেপে আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। শেষে অপেক্ষায় অপেক্ষায় জর্জরিত, আমি আর পারছি না, উঠে পড়েছি অস্থির হয়ে, কান গরম, ব্রহ্মতালু যেন ফেটে পড়ছে, বুঝতে পারছি পারছে ও-ও। ছেলে হয়ে বাবাকে?—ওর নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে।

—মারল?

—ও না। থাকতে না পেরে আমাকেই আমি মারলাম। ওর শিয়রে দাঁড়িয়ে বালিসের তলায় রাখা ছুরিটা আ-স্তে বের করে বুকে বিঁধিয়ে দিয়েছিলাম, আগে গলায়, তারপর বুকে, সব শেষে পেটে—মারলাম। ওর কষ্ট সহ্য হচ্ছিল না, তাই কষ্ট থেকে ওকে মুক্তি দিলাম, আমিই আমাকে মেরে ওকে বাঁচালাম।

বিনীতা, ভিড় ঠেলে একটি বালককে আমি বেরিয়ে আসতে দেখছি। বালক, না কিশোর ঠিক জানি না। ওর বয়স ওরই চোখের দৃষ্টির মতো স্থির হয়ে

আছে। ছেলেটি বলছে, কী বলছে শোনো, বলছেঃ

—বাবা ঠিক কথা বলেনি। বাবাকে আমি মারতাম না। আমরা এখনও তো বাবা-দাদা-কাকা ঘনিষ্ঠ কাউকে তো মারিনি!

—অথচ তাদেরও কেউ না-কেউ নিশ্চয় ব্যবসাদার-জোতদার ঠিকেদার বা অফিসার কিছু না কিছু ছিল? এই সামাজিক বন্দোবস্তের উপস্বত্ব ভোগ করছিল?

—ফাঁকটা দেখতে পেয়েছিলাম আমি, তাই—বাবা জানে না—ফিরতে চেষ্টা করছিলাম, ওর মৃত্যুর পর থেকে।

—কারণ কি ওই একটাই? মানে, ফাঁকটা ধরা পড়া?

মাথা নীচু করে ছেলেটি বলল, আরও একটা কারণ ছিল। নিজেকে নিজে মেরে বাবা যেখানটায় গড়িয়ে পড়েছিল, দেওয়ালে তার ঠিক ওপরেই ছিল আমার মার বাঁধানো ফটোটা। মা নিচের দিকে তাকিয়ে সব দেখছিল।

এর পরে ওকে খানিকটা সময় দিলাম বিনীতা, সামলে উঠতে। তারপর ওর পিঠে হাত রেখে আস্তে আস্তে বললাম, তোমরা তো আগে একেবারে প্রথমে মূর্তিও ভাঙছিলে, না? ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলাম ভাঙছিলে কেন, ওরা তো মৃত। সে বলল, কিন্তু ওদের জীবন-কথা জীবিত। তা-ছাড়া ওদের যা কথা, তাতেও ক্ষতিও হত। সব অন্যায়, আঘাত, অপমান সত্ত্বেও ওরা বলেছেন মানুষের মূল কথা ভালবাসা, দুঃখ-মৃত্যু সব ছাপিয়ে নাকি আগে আনন্দ, অনন্ত শান্তি—কী ভয়ানক সব-ভুলিয়ে-দেওয়া সব ব্যাপার, না?

—খুঁজে দেখো, সংগ্রামের কথাও আছে।

—সেই সঙ্গে আপসেরও। অত্যাচার, শোষণের মধ্যেও আনন্দ শান্তি-টান্তিকে উঁচু করে ধরা—আপস নয়? ওঁদের কথায় ক্ষমাই বড়—ক্ষয়ধরা রক্তহীন যুগের চিন্তা, ওঁরা তারই প্রতীক।

—ক্ষমা ভালবাসার বদলে তোমরা এনেছ ঘৃণা, শ্রেণী-ঘৃণা, এই তো? —মানবিক সম্পর্কের বিবর্তনে তোমাদের যা অবদান। আর সেই সঙ্গে ক্ষমার প্রতীককেও নষ্ট করছ? বেশ। কিন্তু প্রতীক তো আরও কত কিছুর আছে, কত সাবেকী সংস্কারের, যেমন দেবতা ইত্যাদি। তোমরা প্রতিমূর্তি ভেঙেছ কিন্তু প্রতিমার গায়ে হাত দাওনি, বরং ঘটা করে সর্বজনীন পুজোয় পুরোপুরি উৎসাহ, সহযোগিতা সব কিছু দেখেছি। এমন-কি, শিবচতুর্দশীর নামে চাঁদা আদায়ও—তা-ও আষাঢ় মাসে।

শান্ত গলায় ছেলেটি বলল, তা-ও জানি। সেইখানেই তো ফাঁকি।

—আরও শোনো। থানা কি পোস্ট অফিস না হয় সরকারী দফতর, শাসক শ্রেণীর মূর্ত প্রতীক। কিন্তু ম্যালেরিয়া-দমন কেন্দ্রগুলিতে হামলা হত কেন,

ও রোগে তো গরিবেরাই ভোগে বেশি, মরেও, তাই না? কিংবা পরিবার পরিকল্পনা অফিস-টাফিসের ওপরই বা আক্রোশ পড়ত কেন? জন্ম নিয়ন্ত্রণ কি প্রগতি বিরোধী? এই ভুখা দেশে আরও রাশি রাশি ভুখা আর ভিখারী জন্মালে কি সামাজিক ন্যায় বিচারের চেহারা, বৈষয়িক ব্যবস্থার চেহারা আরও মনোহারী দেখতে? জন্মনিয়ন্ত্রণ কিন্তু মহা চীনেও চলে।

ছেলেটি চুপ, শুনতে থাকল।

—মাঝখান থেকে ম্যালেরিয়া আর ফ্যামিলি প্লানিং সেকটারের কর্মীদের অনেকের কাজ গেল, তারা কিন্তু সাধারণ মানুষ, এবং সরকারের বরং খানিক খরচা বাঁচাল। স্টুডিওতে হানাহানির ফলে বেকার হল অনেক ফিল্ম টেকনিসিয়ান, যারা মেহনতী মানুষেরই এক-অংশ। ট্রামের পর ট্রাম পোড়ালে ক্রমশ সারপ্লাস হয়ে পড়ে কিছু ট্রামেরই কর্মী। শহরটা আর একটু অচল হয় ঠিক, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট হয় না। সিনেমায় বোমা ফাটলে দর্শক কমতে থাকে, বিশেষ করে রাত্তিরে, তাতে আগে মারা পড়ে যারা আশেপাশের ছোট পানওয়ালা দোকানদাররা। চায়ের দোকান টোকানও চলে না।

—আপনি আমাকে কনফিউজ করে দিচ্ছেন। ট্রামের কথা বললেন। এই যে এই শহরের ট্র্যান্সপোরট ব্যবস্থা, একে আপনি ডিফেন্ড করেন?

—করি না। ওখানে বোধ হয় তোমার সঙ্গে আমার মস্ত মতের মিল। এখানকার লোকাল ট্রেন, এখানকার ট্রাম-বাস, এমন-কি ট্যাক্সিরও অভাব—যেভাবে লোকে রোজ ঝুলে, থেঁতলে বাঁচি-কি-মরি করে আসে যায়, এই কলঙ্কের তুলনা কোথাও পাবে না। আমি তো মনে করি যে-কোনও একদিন অফিস টাইমে হাতিবাগান থেকে ড্যালহৌসি আসা আর অফিস ভাঙলে ঘণ্টা দুই বাসের পেছনে ছুটোছুটি করে শেষে বাম্পারে চড়ে আধমরা হয়ে বাড়ি ফেরা—একজন মানুষকে বিপ্লবী করে দেবার জন্যে একটা দিনের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। তখন সবই তেতো লাগে কিনা! তিক্ততা নিয়ে অফিসে ঢোকা, সে তিক্ততাকেই দ্বিগুণ করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া—যেমন পুরুষদের, তেমনই মেয়েদের। বর্ষার সন্ধ্যায় আফিস পাড়ার মোড়ে মোড়ে ত্রস্ত, অসহায় মানুষদের মুখের ছবি দেখেছ?

—তবে?

—তবে-এই যে, সেই তিক্ততা কোনও সত্যিকারের ক্রোধের জন্ম দেয় না, অন্তত আমি দেখিনি। যদি কোনও খালি গাড়ি বা একটিমাত্র সওয়ারী বওয়া গাড়ি অনেকে মিলে ঠেকাত, বাধ্য করত অন্তত বৃদ্ধ বা মেয়েদের লিফট্ দিতে, তবে সেই সাহসকে আমি বলতাম সুস্থ, বৈপ্লবিক। দেখি না। তার বদলে দেখি বরং অযথা অপচয় এবং এমন-সব ব্যাপার, যাকে চেহারায় চরিত্রে মনে হয় চক্রান্ত।

—কেন, প্রকাশ্য মিছিল, বিক্ষোভ, এইসবও তো হয়। দ্যাখেননি?

—দেখেছি। কিন্তু মজা কী জানো, বিক্ষুব্ধ হবার কথা যাদের সবচেয়ে বেশি,

তাদের ততটা নয়। যেমন, এই শহরে বেকারদের মিছিল ক'টা বের হয়? প্রতিবাদ যেন তাদেরই বেশি, যারা কোন-না-কোন ভাবে সংস্থিত, কর্মরত। যারা কাজে বহাল কিন্তু কাজ করে না। ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সব চেয়ে সোচ্চার তারাই যারা নেভার হ্যাড্ ইট সো গুড্। তারাই টেবিল চাপড়িয়ে শ্রাদ্ধ আর বাপান্ত করে। তাদের সংগঠিত করায় সুবিধা বেশি। কারণ তাদের সহায়তায় আর চাঁদায় পার্টি চলে; উত্তেজনার আন্দোলনে তাই সম্পূর্ণ কর্মহীনদের চেয়ে অসন্তুষ্ট কর্মীদেরই বেশি বাজার দর। উষ্মা যেখানে নেই সেখানে সেটা খুঁচিয়ে তোলা হয়। অতৃপ্তির উনুনটাকে করা হয় গনগনে।

—আর আমাদের হতাশা? সেটাও কি উড়িয়ে দিতে চান নাকি এইভাবে?

—আদৌ না। আমি জানি, হতাশা কোন্ শ্রেণীর তরুণ আর ছাত্রদের মধ্যে স্বাভাবিক ও সত্য। কিন্তু যারা ব্রিলিয়াণ্ট, কিংবা সংগতিপন্ন? শুনেছি তারাই নাকি সব চেয়ে সক্রিয় চরমপন্থী দলে? ব্যাপারটা তবে নৈকষ্য হতাশা না আদুরে ক্রোধ এবং উষ্মা? কোন্‌টা?

সেই ফ্রেঞ্চকাট্ ব্যক্তিটিকে বেরিয়ে আসতে দেখছি, বিনীতা, তিনি রোষকষায়িত চেখে চেয়ে আছেন আমার দিকে, তর্জনী তুলে গর্জন করে বলে উঠলেন, যথেষ্ট হয়েছে, আর জ্ঞান দেবেন না। মহাশয়, আপনি তারুণ্যের ধর্ম জানেন না। সে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রতিবাদী, ইতিহাসের নানা পর্বে। ইয়ুথ ইজ্ মিলিট্যান্‌ট। সুতরাং কে স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে কিংবা কে ভালো ছাত্র, এই সব লক্ষণ টক্ষণের দোহাই পাড়া অনর্থক। তারুণ্য বিদ্রোহ করবেই. করেই থাকে, এমন কি ধনী, সমৃদ্ধ দেশেও। ফ্রান্‌সে জারমানিতে, স্টেট্‌সে। তার কারণ প্রাচুর্যের মধ্যেও একটা শূন্যতা আছে সেটা একমাত্র সতেজ, টগ্‌বগে যৌবনই দেখতে পায়, তারা ফেটে পড়ে, তারা ফাটায়। তা-ছাড়া সুখের মধ্যেও একটা ক্লান্তি আছে। কেন আপনাদের সুখী কবিও তো চেঁচিয়ে গেয়ে উঠেছেন 'সুখে আমায় রাখবে কেন'—গাননি?

—তাঁর কথা থাক।

—আরও শুনুন, ফ্রেঞ্চকাট তীব্র স্বরে বলল, সমৃদ্ধ, আপাত-তৃপ্ত সমাজেই যদি এই হয়, তবে তো আমাদের দেশে—এ তো পচা গলা সমাজ! ওরা তাই সব জোড়াতালি ছিঁড়ছে—এটা ওদের হিস্টরিক রোল, সব যুগেই তাই করে। সমাজের যেটা সচেতন অংশ, লীড দেয় তারাই; কেন না অন্য ভাগ তো ব্যথায় অচেতন, তারা নিজে থেকে প্রবঞ্চনা অন্যায় টের পায় না, তাদের জাগাতে হয়।

সেই ছেলেটি আস্তে আস্তে বলল, টের পায় না, ঠিক। আমাদের অনেকে গ্রামে কাজ করতে গিয়েছিল ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে। কিন্তু সেই চাষীরাই আমাদের নেয়নি। কোন-কোনও জায়গায় শুনেছি ধরিয়ে দিয়েছে, তাড়িয়েও দিয়েছে। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর যাকে বলে।

—তাতে প্রমাণ হল কী, ফ্রেঞ্চকাট বাধা দিল,—প্রয়োজনটা তো মিথ্যে বলে প্রমাণিত হল না। বড় জোর এইটুকু বলা যায় যে, পরিকল্পনায় ফাঁক ছিল, যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল না। মহাশয়, আপনি কে জানি না, কিন্তু মিসলীড্ করবেন না।

—মিস্‌লীড্ কি আপনিই কম করছেন, মানে আপনারা? ওদের মধ্যে ভয়ানক ভাবে জ্বলে-ওঠা আগুন দেখে সব চেয়ে বেশি ভয় কারা পেয়েছে? আপনারা ওদের এক কালের নেতারা। একদিন যারা আগুন জেবলে দিয়েছেন, পরে তার চেহারা দেখে পিছিয়ে গিয়েছেন নিজেরা। যাঁরা আগে ভেবেছেন বিপ্লব করুক ওরা বাইরে, আমরা করে যাব ভিতরে—কেউ কলেজের ক্লাসে লেকচার ঝেড়ে, কেউ পার্লামেন্টে। বিনা বাধায় পালটা হিংসা ছাড়াই বিপ্লব পয়দা হবে বলে ওদের ঠকিয়েছেন। যারা আর-একটু উপরের শ্রেণীর তাঁরা আবার লিডো রুমে লাঞ্চ খেতে খেতে, কিংবা উত্তেজক পানীয়ে উত্তেজিত হতে হতে এথিক্‌স নিয়ে ডিবেট করেছেন। এখন আর তাল সামলাতে পারছেন না। হাতিয়ার কখনও বা বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে, চারধারে ভেঙে পড়ছে সব—শুধু তো তরুণ সমাজ নয়, সমাজের সবচেয়ে অপরাধপ্রবণ অংশকেই বা রাজনৈতিক রেসপেক্‌টেবিলিটির চেহারা দিয়েছে কে?

ফ্রেঞ্চকাট বলল, বেশ মানলুম, ভাঙছে। কিন্তু সবাই তো ভাঙছে না। বাকী সবাই সায় দিচ্ছে কেন? তার মানে কি এই নয় যে, যা ভাঙছে, তা আসলে ছিল অপদার্থ, অন্তঃসারশূন্য, এক কথায় ভাঙবারই যোগ্য? তাই কোনও স্তরেই তেমন প্রতিবাদ নেই, সবাই ভাবছে জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক না।

—আস্তে। ঠোঁটে আঙুল রেখে আমি বলে উঠলাম—অতো তাড়াতাড়ি শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবেন না। যখন স্কুল-কলেজ-পরীক্ষা নষ্ট হওয়ার কথা বলেন, তখন মনে হতে পারে আপনার যুক্তি খাঁটি, কেন না এই শিক্ষাব্যবস্থা সত্যিই বন্ধ্যা। ইনডাসট্রির বেলাতেও আপনার যুক্তি কতকটা খাটে, কারণ সত্যিই তো অনেক অন্যায় অনাচার আর গলদের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে অনেক কলকারখানা। তাই এ-সব নষ্ট হতে দেখেও কারও বিশেষ হায়-আফশোষ নেই, দীর্ঘশ্বাস পড়ছে না। কিন্তু আপনার যুক্তিটা আর একটু বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত করি যদি, ফাঁকটা হাঁ হয়ে পড়বে অচিরাৎ। লোকে যা ভালো নয় তার বিদায়-বিতাড়নই যে খুশী মনে মানে তা-নয়। যা ভালো লাগছে, তাকেও কেউ কেউ কেড়ে নিলে কখনও কখনও চুপ করে যায়। প্রতিবাদ নানা কারণেই করে না। নমুনা দেব? শুনুন তবে। একঃ সিনেমা দেখছি, হলে বোমা ফাটল, আমরা সব্বাই ছুটে পালিয়ে এলাম, তার মানে কি এই যে ছবিটা আমরা উপভোগ করছিলাম না? ট্রেনে করে যাচ্ছি অসুস্থ মাকে দেখতে, মাঝ রাস্তায় গাড়ি কারা আটকাল, চুপ করে বসে রইলাম অপেক্ষায়—কতক্ষণে গাড়ি ছাড়বে, যাওয়াটা তবে কি আমার জরুরী ছিল না, কোনও তাগিদ, কোনও উদ্বেগ বোধ করিনি? তা নয় বোধ হয়। বাধ্যতা মানেই সায় দেওয়া নয়। মৌন সর্বত্র নয় সম্মতির লক্ষণ।

আরও নমুনা চান? বাসের দোতলায় সামনের আসনে প্রেমিকা প্রেমিক। কারা এসে হুকুম দিল, নেমে যান সববাই, এই বাসে আগুন দেওয়া হবে। ওরা নেমে গেল। সুড়সুড় করে সবাই নেমে গেল। বাস থেকে এইভাবে সবাই নেমে যায়, কিন্তু তারা সকলেই কি বাসটার পুড়ে যাওয়াই ঠিক মনে করে? আরও দৃষ্টান্ত দেব? মাঝ রাত্তিরে, আপনার শোবার ঘর, ধর্মপত্নীর সঙ্গে আইন সিদ্ধ মিলনের চরম মুহূর্ত—ঠিক তখনই দমাদম ধাক্কা পড়তে লাগল দরজায়, আপনারা ছিটকে আলাদা হয়ে যাবেন না তৎক্ষণাৎ? হেতু? এনজয় করছিলেন না অ্যাক্টটা, আপনার দেহমনের সায় ছিল না?

বিদগ্ধা শ্রোতা ভদ্রলোকের কপালে ঘাম ফুটছে, দেখতে পাচ্ছি, বিনীতা, আমার বুকের সাহস বাড়ছে, জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী, টের পাচ্ছি।—তবেই দেখুন, বলে চললাম, চুপ করে থাকার অনেক কারণ সম্ভব। এক—সংখ্যালঘুতা, দুই অসহায়তা, তিন ভীরুতা। চার-পাঁচ-ছয় আরও হরেক কারণ দেখাতে পারি। কারণগুলো, আপনারাও যে জানেন না তা নয়, তবে কবুল করেন না। তা-হলে এত দিনের সব মুখস্ত করা বিদ্যে আর আওড়ানো বুলি মিথ্যে বলে মেনে নেওয়া হয়। তা-হলে যেচে 'অপ্রগতিবাদী' এই ছ্যাঁকাটা গায়ে আঁকতে হয়। যেচে কে ফেন্স-এর উল্টো ধারে দাঁড়াতে যায়? তাই অনেকেই যতক্ষণ পারে রেলিং আঁকড়ে ধরে মুখ আর মান বাঁচায়।

—আপনার সে-ভয় নেই?

—আদৌ না। ভয় নয়, কথাটা দুর্বলতা, মায়া। গোড়া থেকেই অগতির দিকের ছাপ-মারা হয়ে আছি কিনা, তাই মায়া, লোভ আর দুর্বলতা আমার কম। তবে ভয়? না, তাকে এখনও জয় করতে পারিনি। কিন্তু আপনার অশেষ সংকট। স্বদলের লোকও সন্দেহ করে, গতকালের সহযাত্রীরাও রেনিগেড্ বলে। যেই অন্য একটা উপদলের কাগজ আপনাকে দালাল বলে গাল পাড়ে, অমনই আপনি যে এখনও বাইশ-চব্বিশ কারাট বিপ্লবী, সেটা প্রমাণ করতে আপনি প্রমাণ সাইজের প্রবন্ধ ঝাড়েন। ভাবেন, ব্যস, পঞ্চগব্যে সংশোধন হয়ে গেল। আপনিও যে এই ব্যবস্থার উপস্বত্বভোগী, বড় গ্র্যান্টের চেয়ারের দখলদার, উপরন্তু ডিক্যাডেন্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও সমঝদার—ওই এক প্রবন্ধে সেই সর্বদোষ খণ্ডে গেল।

—রবীন্দ্রসঙ্গীত আপনাদেরই মনোপলি বুঝি?

—খোদার কসম, তা কেন, তা কেন। আপনাদেরও। সকলেরই যাতে থাকে, এই গান যাতে বাঁচে তাই তো লড়ে চলেছি।

—মানে?

মানে, গভীর মরমী মূল্যের সন্ধ্যান তো আছেই। তবু তারই সঙ্গে রোজকার রাজনীতি নিয়েও মাঝে মাঝে লিখি এই কারণে যে, দ্বিতীয়টা সুস্থ নীরোগ না হলে, গভীর মরমী কিছু লেখার বা গাওয়ার স্বাধীনতাও থাকবে না। তবু— কী জানেন, স্বীকার করছি—যা ভাবি তা লিখি না, সোজা করে তো অনেক সময়ই না, কেমন যেন বেঁকে যায়। সেই আত্মগ্লানিতে ভুগছি।

—আত্মগ্লানি?

—হ্যাঁ। যে-বালাই আপনাদের নেই, প্রকাশ্যে তো নেই-ই। ভুল কবুল করেন না কেউ, বরং ডবল ভুল দিয়ে চাপা দিতে চান। গ্লানি নেই আরও এই হেতু যে, আপনাদের মগজ বিলকুল বিধৌত, ডায়েড্ অ্যান্ড্ ক্লীন্ড তা মহাশয়, আপনি কী ভাবে কাচা—আরজেন্ট, না অরডিনারি?

—অর্ডার, অর্ডার, গর্জে উঠলেন হাকিম, বড় পারসোনাল হয়ে যাচ্ছে, এ চলবে না।

ফ্রেঞ্চকাট বললেন, থমথমে মুখে, আমি বিপ্লবের ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় বিশ্বাস করি।

—বিপ্লব? আপনার কি মনে হয় না অতি-ব্যবহারে শব্দটা শস্তা হয়ে গিয়েছে? ভালো ফসল হলেও আমরা আজকাল বলি 'সবুজ বিপ্লব।' যে-কোন রকমের পরিবর্তনকে বলা হয়ে থাকে বৈপ্লবিক। কিন্তু বিপ্লবের যেটা আসল মানে, সেটা যে হতেই হবে, এ-কথা কে কবে কোথায় মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে?

—বলেছি তো, ওটা ঐতিহাসিক, অমোঘ!

—সব দেশের ইতিহাসে, দুনিয়ায় যত দেশ আছে? মধ্য প্রাচ্যে আর দক্ষিণ আমেরিকায় বছরে পাঁচ সাতবার যা ঘটে, তাকে নিশ্চয় সত্যিকার বিপ্লব বলেন না? তা-হলে বাকী থাকে পাঁচ মহাদেশ আর দুই শতক মিলিয়ে বড় জোর আধ ডজন দেশ। সেই ক'টা দেশের কয়েকটা ঘটনাকে সারা দুনিয়ার ভবিতব্য বলে চেঁচানো আত্ম-প্রতারণা, প্রতারণা তারুণ্যকেও, নতুন জেনারেশনকে। চেয়ে দেখুন, ওই ছেলেটির দিকে। পুঁথিগত বিশ্বাসে ভ্রান্ত আপনারা পেঁাছেছেন এখানে। আর আপনাদের কথায় উদভ্রান্ত ও কোথায় এসে পেঁাচেছে, দেখছেন না? না পারছে এগোতে, পিছোতেও পারছে না। আজ যদি ওর ভুলও বুঝতে পারে, তবু ফিরতে পারবে না। কঠিন বিষয় আর কুটিল সন্দেহে ওকে হয় বেঁধে রাখবে, নয় মারবে।

—সম্পূর্ণ তত্ত্ব অস্বীকার করছেন আপনি?

তত্ত্ব মানে তাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা যা লিখেছেন, লেখেন, তাই তো? ওই যে, আপনি আগে যা বলেছেন—সব কিছুর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা? দেখুন অর্থনীতি অনেকখানি বটে, অতিশয় যে গুরুত্বপূর্ণ তাতেও সন্দেহ নেই, কিন্তু ইতিহাসের একটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাখ্যাও আছে। সেটাকে একেবারে অবৈজ্ঞানিক বলে উড়িয়ে দেবেন না। এক একটা পরাক্রান্ত ব্যক্তি, অচরিতার্থ চরিত্র, অঙ্গে বিকল কিংবা বিকল মনে, ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটিয়েছে পৃথিবীতে, ইতিহাসের বিরাট বিরাট অধ্যায় গর্ত আর আবর্ত সৃষ্টি করেছে—জানেন না? মানেন না?

—তাই বলে এই অন্যায় অর্থনৈতিক বিন্যাস আর পদ্ধতি, বলতে চান এর কোনও পরিবর্তন হবে না?

—হবে। কিন্তু বাড়িটাকে বসবাসের যোগ্য করতে সব সময়ে কি ভেঙে ফেলতেই হয়? অন্য কোনও উপায়ে কি বাসযোগ্যতা আনা যায় না? অন্য

সব ব্যাপারে তো সম্ভবই, এমন কি এই যে এখনকার অতি নিন্দিত শিক্ষা ব্যবস্থা, পুঁথি, পড়াশুনা, তার হয়েও দু'চারটে কথা বলা যায় কিন্তু। অন্তত যে-সিসটেমে মারক্স থেকে আপনাদের মতো বুধ ও সুধীর উৎপত্তি-ব্যুৎপত্তি হয়েছে, তাকে একেবারে আবর্জনা বলে উড়িয়ে দেওয়া সাজে না!

এবার ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন হাকিম বললেন, আবার ব্যক্তিগত কটাক্ষ? মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এবং সীমা। আর না। নেক্সট্ উইটনেস, নেক্স্ট্. নেকসট!

॥ সাত ॥

বিনীতা, আমার জন্যে বসে থেকে থেকে কি ভয় পাচ্ছ তুমি, ভাবছ আমাকেও মাঝ পথ থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে নিয়তি, যে-নিয়তি ক'মাস আগে ডেকে নিয়ে গিয়েছে তোমার দাদা সুব্রতকে? আসছি, আমি আসছি। তার আগে আর কয়েকটা মুখ চিনে নিই, বাকী নেই আর বেশি।

—আপনি?

—শ্রীমতী প্রিয়বালা দেবী।

—আপনি এখানে? মহিলাটির বয়স আর বিষাদে মহিমান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়টা প্রশ্নের আকারে বেরিয়ে এল।

—নীলেশের নাম পড়েছেন না, কাগজে বেরিয়েছিল, যেদিন আমাদের পাড়ায় আরও ছ'জনকে টেনে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দিয়ে পার্কে ফেলে রেখে যায়, তার মধ্যে নীলুও ছিল। জানেন, নীলুর মৃত্যুতে আমি কাঁদিনি, কাঁদতে পারিনি! আরও যার যার ছেলে গেল, কিংবা ছোট ভাই, সেইসব মা কিংবা দিদিরা—আমাদের পাড়ায় কেউ কাঁদেনি।

—কেন?

—ওরা যে শাসিয়ে দিয়ে যায় একটু পরেই। বলে, চুপ! চেঁচিয়ে বেশি জানান্ দিয়ে দিলে বাড়িসুদ্ধ উড়িয়ে দেব।

—মা, আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করার নেই। আপনি নেমে আসুন।

বিনীতা, তৎক্ষণাৎ আমার মনে হল, কোন্ শহরে আবার ফিরব আমি, একে আমি একটুও চিনি না তো। মনে মনে ছবি এঁকে নিলাম ওই পাড়ার একটি পার্কের ধার-ঘেঁষা নির্জন রাস্তার। সন্ধ্যা রাত কিন্তু নির্জন। এই রাস্তারই সাতটা বাড়ির সাতটা ছেলে আজ খুন হয়ে গেছে, তবু সব স্তব্ধ, সমাধির মতো, কেউ কাঁদছে না। মনে হল, যেন ঢুকে গেছি বোবা একটা কালে, ভীষণ ভাবে সন্ত্রস্ত একটা স্থানে, যেখানে মা-বোনেরাও নির্বাক হয়ে থাকে, নিহত পুত্র বা ভাইয়ের জন্যেও কেঁদে উঠতে পারে না। তবু ওরই মধ্যে যেন শুনতে পাচ্ছি থেকে থেকে ডুকরে ওঠা একটা কুকুরকে, জনহীন, অন্যথা-

শব্দহীন ওই প্রেত-পরিবেশে। নিঃশঙ্ক একমাত্র ওই প্রাণীটা—মানুষ নয় কি না, তাই ডেকে উঠতে কি কাঁদতে ভয় পায় না।

—আমার শেষ সাক্ষী আপনি, কী নাম বললেন যেন, নিত্যানন্দ গাঙ্গুলী? বেশ, এগিয়ে আসুন, কী এজেহার দিতে চান দিয়ে ফেলুন এই বেলা। কী? একটার পর একটা খুনের খবর পড়ে যাচ্ছিলেন, ক্রমে ক্রমে স্নায়ুতে আর কোনও সাড়া, কোনও উত্তেজনা ছিল না? সে আর নতুন কী, বলুন তারপর? একদিন ভীষণ চমকে গেলেন, যখন শুনলেন আপনার প্রতিবেশী সতীশ রায় নিহত? সজ্জন, বিদ্বান ব্যক্তি, শুনেছিলেন উনি রিটায়ার্ড হেডমাষ্টার, আর আপনি, ক্লাইভস্ট্রীটের নাম-করা একটা হৌসের বড় বাবু, আপনি তাই স্বভাবতই হলেন দুঃখিত? হবেনই তো—স্বাভাবিক, মানবিক। কী বললেন, শুধু ব্যথিত হওয়া নয়, আপনি ভয়ও পেয়েছিলেন? কেন বলুন তো, কেন। আজকাল তাই হয় বুঝি আপনার, বিশেষত যখন শোনেন কোনও নিহত ব্যক্তিও ছিলেন বয়স্ক? সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, পরবর্তী শিকার আপনি হবেন না তো! আহা! দুঃখ নয় শোক নয়, আসল কথাটা তা হলে ভয় নিজের জন্যে, সেইটাই প্রতিক্রিয়া? সেই ভয়কেই তাড়াতাড়ি শোকের চেহারা দেন, সমবেদনায় আপনার চোখ দু'টি হয় কম্পিত? বেশ, বেশ তারপর বলুন।

মৃত ব্যক্তির সঙ্গে মনে মনে নিজের চেহারাও মেলান নাকি, আপনার সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড় একটু কাত করে পরীক্ষা করেন 'মরা মানুষটাকে পিছন থেকে দেখতে অনেকটা আমারই মতো ছিল নাকি? টাক, গর্দান, পাঞ্জাবির ময়লা লাইনিং—একই রকম? এবং সেই ভাবনায় আর একটু বেশি ভয় পেয়ে যান? আর সেই ভয়ে, টাকের ব্যাপারে কিছু তো করার নেই, এই বয়সে পরচুলাও পরা যায় না, তাই পানজাবির বদলে শার্ট পরতে শুরু করে দেন, যেহেতু শার্টের কলার আছে? চমৎকার! বলুন, আর? আরও কিছু বক্তব্য আছে নাকি আপনার?

বলছেন যে, সেই থেকে ভাবতে শুরু করে দেন, কী-কী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত হতে পারে! 'কই আমার তো তেমন কোন দোষ নেই' এই বলে সাহস আর সান্ত্বনা দিতে থাকেন নিজেকে, নিজেরই পিঠ চাপড়ানি? উত্তম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও কি মানসাঙ্কের হিসেবে ঢুকে পড়ে যে, 'ওই লোকটির কি কোনও দোষ ছিল? সজ্জন, শিক্ষিত ব্যক্তি অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার, নিজের মনে লেখা-পড়া বাজার-বাগান টুকিটাকি নিয়ে থাকতেন, কারও সঙ্গে কোনও দিন ঝগড়া হয়েছিল বলে মনে পড়ে না, অত্যন্ত স্নেহশীল অমায়িক ব্যক্তি—তবে? কী করে হিসেবটা মেলাবেন? মানসিক পীড়া থেকে নিষ্কৃতি পেলেন কী করে?

কী বলছেন? জোরে বলুন। দু'দিন মন খারাপ নিয়ে অফিসে যাচ্ছিলেন আসছিলেন, তৃতীয় দিন রেশনের দোকানে গিয়ে শোনেন, কারা বলাবলি করছে

নিজেদের মধ্যে—'শুনছি নাকি ওর একটা বাড়তি রেশন-কার্ড ছিল?' . ব্যাস তক্ষুনি মনে মনে বলেছেন ইউরেকা, অর্থাৎ লোকটার হত্যার একটা হেতু খুঁজে পাওয়া গেল। পলকে বুক হালকা, তলপেট হালকা, তলে তলে এই তো খুঁজছিলেন আপনি—ওর হত্যার একটা সমর্থন? "লোকটাকে যা ভাবতাম তা ছিল না কিন্তু!" অঙ্কটা কষা সহজ হয়ে গেল, মনে মনে চাপা গলায় বললেন, সেই কথা বলাবলিও করলেন অন্তরঙ্গ মহলে, বাড়তি রেশনকার্ড যখন ছিল, তখন আরও অনেক দোষ ছিল নিশ্চয়ই, ক্রমে ক্রমে জানা যাবে, ওরা জানতও, যারা মেরেছে তারা, তাই তো প্রাণদণ্ডাজ্ঞা জারী হয়ে গেল। লোকটির বাঁচার নৈতিক অধিকার ছিল না নিশ্চিত জেনে সেই দিনই নিশ্চিন্ত এক চুমুকে এক গ্লাস জল খালি করে ফেললেন? চমৎকার!

সব এজেহার নেওয়া শেষ, আমি এখন কী করছি? হঠাৎ দেখি, উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করছি "হুজুর, ধর্মাবতার! আপনি স্বকর্ণেই তো শুনলেন। এদের প্রত্যেকে মূল্যবোধ বিকিয়ে দেওয়ার দায়ে সমান অপরাধী, যারা সাক্ষ্য দিল এইমাত্র, যাদের কেউ জীবিত, কেউ মৃত, যারা ভয় পেয়ে আপস করেছে, তারা সকলে; দায়ী তারাও, যারা সায় দিয়েছে। ভাঁওতা মেরেছে, ঠকিয়েছে নিজেদের, ভ্রান্ত-বিভ্রান্ত করেছে সর্বজনে। অপরাধী তারাও, যেমন এই শেষের ভদ্রলোক, যারা হত্যার প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না বলে প্রথমে মরমে মরে থেকেছে। পরে হন্যে হয়ে খুঁজেছে একটা হেতু। কল্পিত বা সত্য একটা ছুতো খুঁজে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে ভেবেছে যে যাক বাবা! এবার নিজের সঙ্গে সসম্মানে বৈধভাবে সহবাস করা যাবে! এমন কি দায়ী সেই মা-ও, ছেলের মৃত্যুর পর যিনি মুখ বুজে ছিলেন, গলা খুলে কাঁদতে পারেননি। এই সত্তরের দশকের শুরুতে কত স্তরে কত জন কত ভীরুতা অথবা ভাঁওতার চুনকালি মেখে আত্মপ্রতারণা করে আর ভয়কে ঘুষ দিয়ে সম-সময়ের সঙ্গে সন্ধি করে চলেছে, তার সম্পূর্ণ আর যথাযথ ইতিহাস যদি কখনও রচিত হয়, ভাবীকাল চমকে যাবে।

তখনই চার দিক থেকে অজস্র কণ্ঠস্বর, একঝাঁক মৌমাছির মতো, ধেয়ে আসছে। ছেয়ে ফেলছে। শুনতে পাচ্ছি একটিই গুঞ্জন 'আর আপনি,' "আর আপনি?"—এটি ধিক্কার না ধ্বনি? আমাকে আক্রমণ করছে, অকরুণ হুল আর অসহ্য দংশন, আর পারছি না, দু'হাতে কান চেপে বিনীতা, ব্যাঙের মতো বুকের ভিতরটা বাতাসে ভরে, আমি এখন ছুটে পালাচ্ছি।

॥ আট ॥

ফিরছি, আমি ফিরছি, কিন্তু কোন্ ঘরে? আবার সেইখানে কি, যেখানে আমি শরশয্যায় শয়ান, অসংখ্য ভয়ের ছুঁচ সর্বাঙ্গে বিঁধিয়ে স্মরণ করি ক্রতুং স্মর, কৃতং স্মর? পুনর্মূষিক আমি পুনরায় সেইখানেই জাগরিত হব?

মন চাইছে তার চেয়ে আরও একটু দেরি করে যাই বরং ছায়াচ্ছন্ন বাগানে, যেখানে ঝিলের জলে পা ভিজিয়ে, আরে এ কে? সর্বেশ না? আমার সতীর্থ লেখক সর্বেশ, সে একা এইখানে জলের নীচে খোলা দুটি পা মগ্ন করে, কী হেতু, কী উদ্দেশ্যে?

কাছে গেলাম। সর্বেশ পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল। আমাকে কাছে ডাকল।

—তোমাকে এখানে দেখব ভাবিনি সর্বেশ। তুমি তো সদা আনন্দে থাকো, সখা-বয়স্য পরিবৃত; ভেবেছিলাম—

—আমি এখন কোনও সরাইখানায় কি পানশালায়, না? সর্বেশ স্নিগ্ধ দুটি চোখে হাসল, আজকাল আর ওসব জায়গায় যেতে চাই না, ভালো লাগে না, তবু কী যেন আমাকে টানে।

বিনীতা, মনে হল সর্বেশও ভীত। সে বলল, কিন্তু তোমারও তো পাত্তা পাই না। তুমি আজকাল কোথায় আছ?

—পালিয়ে।

—আমিও তাই। সর্বেশ বলল, আজ এখানে, কাল ওখানে। ওয়ানটেড্ ক্রিমিনালের মতো। এই জায়গাটা নিরিবিলি, বেছে বেছে তাই ঝিলের ধারে বসেছিলাম। পা ডুবিয়ে দেখছিলাম, আরও কতটা ডোবা যায়, ডোবালেও আমি জ্যান্তই থাকতে পারব কিনা।

বললাম, নিরিবিলি জায়গা মাত্রই কিন্তু নিরাপদ নয়।

সে বলল, জানি। লোকালয়ে ভয়, নিরিবিলিতেও জীবন-সংশয়। আমরা কোথায় যাব বলতে পার? সমাজের কাছে কী অপরাধ করেছি? তুমি পান-শালার কথা বলছিলে, আজকাল কী যে হচ্ছে, ওসব জায়গায় গিয়েও এলোমেলো ব্যাপার করি! পুরনো জায়গায় চেনা মুখ, ভালো লাগে না, সেদিন—সেই শেষবার—ঢুকলাম নতুন একটা সরাইখানায়। সেখানেও ছিল রঙবেরঙের বোতল সাজানো সারি সারি টেবিল আর চেয়ার, একদিকে উঁচু করে তৈরী একটা বেরিয়ার, যাকে বলে বার। তার ওদিকে একটা লোক ফরমাস নেবে বলে দাঁড়িয়ে ছিল, যেমন থাকে! খদ্দের কেউ নেই, তাকে দেখাচ্ছিল একটা ভুতুড়ে খুঁটির মতো। অমায়িক হেসে মাথা নোয়াল সে, অর্থাৎ 'কী চাই?' আমি বললাম "পালসেটিলা টু হানড্রেড্," অম্লান বদনে! ভুতুড়ে-দেখতে লোকটা নিজেই যেন ভূত দেখে চমকে উঠল। খসখসে গলায় বলল "লিকুইড্, না গ্লোবিউল?"

সটান বললাম "পেলাবিউল।"

"হবে না। এখানে সব লিকুইড্" সে বোতলগুলো দেখিয়ে দিল। আসলে ভড়কে গিয়েছিল। আমি যদি চাইতাম স্রেফ জল, হা-হাঃ বারে গিয়ে শুধু জল, তা-হলেও তো এতটা ভড়কাত না। কণ্ঠনালীতে, বুকের পাঁজরের নিচে. এমন কি পাকস্থলীতে যে জল জ্বলে, ও আমাকে বোধহয় সেই জল গেলাতে চাইছিল। কিছুতেই আমি যখন গোঁ ছাড়লাম না, বললাম, পালসেটিলার বদলে বড় জোর আরনিকা নিতে পারি, না হয় ব্রায়োনিয়া মাদার-টিংচার— তখন সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ভীষণ একটা ভঙ্গি করল। 'আগে থেকেই কোথাও গিলে এখানে আসা হয়েছে বুঝি?' যমদূতের মতো থমথমে গলায় সে বলছিল 'আমাদের এই সরাইখানায় যারা আসে, তারা সব খালি পেটেই অসে। বাইরে থেকে তৈরী হয়ে আসা মক্কেল আমরা নিই না।' যমদূতটা সোজা আমাকে একটা গলাধাক্কা দিল। বুঝলে, গলাধাক্কা—ওখান থেকেও! তা-হলেই বুঝছ সময়টা কেমন যাচ্ছে?

বলতে বলতে সর্বেশ উত্তেজিত হল, তার গলা কাঁপছিল।—কী ঠিক করেছি জানো? যারা মারবে বলে পাঁয়তাড়া করছে, স্থির করেছি তাদের সেই সুযোগটা দেব না। এর চেয়ে আত্মঘাতী হওয়া ভালো। যদি হই. তবে সেই চিরকুটটাতে কী লেখা থাকবে জানো? আমার শেষ রচনা, আমার ভারডিক্ট-এর ভাষা হবে এই "আমার মৃত্যুর জন্য স্ব-সময়ই দায়ী, দায়ী এই কালের প্রত্যেকে।" বড় বড় অক্ষরে লিখে যাব।

সর্বেশ হাঁপাচ্ছিল।—"একটা ছোট্ট পদ্য লিখেছিলাম, জানো? কোথাও ছাপাতে পারিনি, রাজী হচ্ছে না কেউ। শুনবে তার কয়েক লাইন, শুনবে?

সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই সর্বেশ বেশ স্বরাঘাত সহকারে পড়ে গেলঃ

"কলকাতায় এই জুলাইয়ে একটি বিলাপই মাত্র স্বরভঙ্গ লিপিমতে গেয়।/ভণ্ড আর ষণ্ডদের ভণ্ড আর ষণ্ড আমি সম্মুখীন বলতে পারিনি/গলা আর চোখ দুই-ই কবরের মতো বুজে গেছে/হে বিধাতঃ, এর চেয়ে বোবা হয়ে যাওয়া ছিল শ্রেয়॥ আপাতত সেই গ্লানি স্থিতধী ও সাবধানী বিবেকের ছিপি খুলে উপছে পড়ছে/ 'হমর দুখক নহি ওর' এই গৎটার গর্তে পড়ে ছটফট করছে/চিঁ-চিঁ ডাক ডেকে ডেকে বেঁচে বর্তে থাকতে চেয়েছে—সেই গ্লানি।

সর্বেশ থামল।—আর একটু আছে, শুনবে? শেষটা এই রকমঃ

"চিঁ-চিঁ ডাক, মিহিমিহি, সখাদের (আছে নাকি?) ডেকে বলা 'সুখে আছি।' আর? ক্রমাগত খেয়ে যাওয়া কুটকুট দাঁতে—কী এবং কাকে? একদিন চেয়ে দেখি, কই সুখ? আমি কই? তা-হলে কি এতদিন কুরে...কুরে... কুরে...বরাবর খেয়ে যাচ্ছি অকৃত্রিম একমাত্র আমাকে?"

শেষ করে সর্বেশ ভগ্নকণ্ঠে বলল 'কেউ ছাপল না। বোধহয় কবিতাই হয়নি, তাই। যাক বাবা, আমারও সময় নেই ওটাকে নিয়ে নিয়ে ধরনা দেওয়ার, মাথার

ঘায়ে এমনিতেই বলে খ্যাপা কুকুর হয়ে আছি। কতো ছোট থেকে নিজের মেরিটে না হয় না-ই বললাম, অন্তত নিজের চেষ্টায় আর পরিশ্রমে, একটু দাঁড়িয়েছি, তোমরা তো দেখেছ। সামান্য বাড়িটাকে আস্তে আস্তে ছিমছাম একটা আস্তানা করতে পেরেছি। অহোরাত্র ঘুরে ঘুরে, সব মানুষের ভালোর জন্য কাজ করে, মানুষকে চিনে চিনে ফেরা—সেই উন্মোচনের পরিণাম কি এই জীবন? নিজের তৈরি বাড়িতে আর বাসও করতে পারি না, নিজের বিশ্বাসের বাসাতেও না। দূর থেকে দূরে চলে যেতে হয় কখনও কখনও, অজ্ঞাতবাসে দিনের পর দিন কাটে; কিংবা পরিজনহীন পরিবেশে হোয়াই ডিড্ আই ডু টু আর্ন্ দিস? বলো, বলো, বলো।

সর্বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।—দিনে লিখে লিখে লিখে ঘাম ঝরানো, রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে—কী কঠিন মূল্যে একদিন মাথা তুলতে পেরেছিলাম বলো তো! আমার কালের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হওয়া, তার জন্যে আমার কতোখানি তিলে তিলে দিতে হয়েছে ভাবো তো? এই যে, প্রেমিকাকে যেমন বলা চলে সেই ভাবে, কত রাত আমার শিল্পকে বললাম 'আমার জাগরণ দিলাম তোমাকে, বিনিময়ে তোমার অগাধ শান্তি আমাকে দাও!' তার প্রত্যুত্তরে সে আমাকে—আমাদের এই দিল? শিল্প! দ্যার্ট ষ্ট্রীটওয়াকার, দ্যাট্ হোর্!

সর্বেশ শব্দ করে থুথু ফেলল, পরে স্বকীয় ঠোঁট চেটেপুটে শুরু করল, —আবার অনেক বিয়ে যেমন ভেঙে যায় জানো, স্বামী-স্ত্রীর চারিত্রিক বৈষম্যের চড়ায় ঠেকে, ইনকম্প্যাটিবিলিটি অব্ ক্যারাকটার, মানে রাজযোটক হয়নি আর কী, আমাদেরও তাই। মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের এই যে সময়, এর সঙ্গে আমাদের বিবাহও ঠিক রাজযোটক হয়নি। গাঁটছড়া এখন গিঁটে গিঁটে লাগছে। শী ডাজ্ নট্ ডিজার্ভ আস্।

স্বীকার করি, সর্বেশ বলছিল, চরিত্রে ফাঁকি আছে আমাদেরও। হয়তো লেখার জন্যে যা দেওয়া উচিত ছিল, তা দিইনি, চুরি করেছি দানসামগ্রীতে। (সর্বেশ একটু থেমে হু-হু করে গেয়ে উঠল 'আমার যা আছে আমি সকলই দিতে পা—রি-নি হে নাথো)। তার চেয়েও পাপ করেছি, লেখাকে কখনও কখনও করেছি পণ্যস্ত্রীর মতো। প্রেরণায় বা আনন্দে লিখিনি, লিখেছি চাপে পড়ে, দায়ে পড়ে, ফরমাসে। জানো, কম বয়সের দেখা একটা দৃশ্য আমার মনে দাগ কেটে বসে গেছে। বারবার ফিরে ফিরে মনে আসে। তখন নিষিদ্ধ পাড়ায় প্রায়ই ঘোরাঘুরি করি—স্রেফ কৌতূহলে, আর কিছু না। একদিন খুব ভোরে, রাস্তাটা ভিস্তি জল ঢেলে ধুয়ে দিয়ে গেছে, দেখি একতলার একটা জানালায় তক্তপোষে বসে একটা মেয়ে তখনও গান গাইছে। মেয়েটার চোখে কালি, চুল খোলা, যেন হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে আছে হারমোনিয়ামটার উপরে, বেসুরো আর বসা গলা, গান আর বেরোতে চাইছে না। তার সামনে ঢুলুঢুলু চোখে তার বাবু কর্কশ গলায় কেবলই হুকুম করে চলেছে 'গাও, গাও, আরও গাও।' মেয়েটা না পেরে একবার থামে আর কাপ্তান বাবু ধমক দেয় 'চালাও চালাও,

মেরে জান চালিয়ে যাও' তার যেন হিসহিস চাবুকের মতো গলার স্বর, মেয়েটার পিঠে পড়ছে, পড়ছে মুখে সর্বাঙ্গে, আর গানের নামে বেরিয়ে আসছে তার ভাঙা গলার গোঙানি, মেয়েটা জোরে রীড্ টিপে হারমোনিয়ামটার ওপরে লুটিয়ে পড়েছে।

এই ছবিটা, সর্বেশ বলল, আমার অনেক লেখাতেই ফিরে ফিরে এসেছে। তার কারণ কি এই যে, মনে মনে ওই মেয়েটার সঙ্গে আমি নিজেকে মিলিয়ে ফেলেছি? গলায় গান আসছে না, শরীর আর টানছে না, তবু গাইতেই হবে বাবুর আদেশে বা ফরমাসে; ইচ্ছে নেই, তবু ক্রমাগত লিখতে হবে ফরমাসে —সমস্ত জীবন ধরে? বাঁচার জন্যে? এ-যাবৎ যা লিখেছি তা-ই আমাকে বাঁচানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়? তার কিছুই থাকবে না? তাই নতুন নতুন লেখা নিত্য নতুন ছুঁড়ি ধরার মতো, কোনও কোনও জীবের মেটিং সীজন-এর মতো রাইটিং সীজ্ন—বিশেষ করে এই শরৎকালে। না? লেখাকে কি বেশ্যা করেছি, নাকি বেশ্যা হয়ে গেছি আমরা?

যে হাওয়া বইছিল, তার সঙ্গে সর্বেশের গলার স্বরের মিল ছিল। সে বলছিল, এই পাপ। নিজেকে আজকাল লজ্জাহীন শীতের মতো লাগে। কিন্তু ওই পাপ তো আমার প্রতি। অন্যায় অবশ্যই অনেক করেছি, কিন্তু সে অন্যায় কার প্রতি? নিজের প্রতি, স্বজনের প্রতি, দু'চারজন ব্যক্তির প্রতি। কিন্তু সমাজের সম্পর্কে তো নয়। কী ক্ষতি করেছি আমি, আমি বা আমাদের মতো আর যারা, আমাদের সময়ের বা সমাজের, যে ফেরারী আসামীর মতো গা-ঢাকা দিয়ে ফিরতে হবে?

অন্ধকার নেমে আসছিল। আমি হাত রাখলাম ওর পিঠে। বললাম, সর্বেশ ওঠো। 'একদা ছিল না জুতা'—মনে আছে এই পদ্যটা? তোমার কথা শুনে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। "ভালো লিখে থাকি বা নাই থাকি, কারও কোনও ক্ষতি তো কখনও করিনি' ঠিক এই কথাই সেদিন বলছিলেন মনিময়বাবু আর বিদ্যুৎবাবু, সাহিত্যের দুই কর্ণধার আমাদের এই সময়ের। দু'জনেই আমাদের অগ্রজ, অগ্রণী। মনিময়বাবুর কথা ভাবো তো? সেদিন দেখতে গিয়েছিলাম। লোহার গেটের পর গেট, গেটে তালা, তার পিছনে বাস করছেন মনিময়বাবু, শুনলাম গার্ডও আছে দু'জন, বাড়িটা যেন একটা পরিখা-ঘেরা ক্ষুদে গড়, ভাবো তো। মনিময়বাবু, আমাদের সকলের যিনি অগ্রগামী, একদিন যিনি তন্নতন্ন করে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন ভারতের আত্মা, প্রান্তরে পল্লীতে জনপদে খুঁজেছেন গণজীবনের প্রাণসত্তা, এই জীবন এখন তাঁর। তাঁর সঙ্গে আমাদের মতভেদ ছিল, তাঁর জীবনবোধকে আমাদেরও বলে মেনে নিতে পারিনি। তবু তিনিও বন্দীপ্রতিম আজ—ভাবতেও ভিতরে বিস্ময় আর প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

অথচ আশ্চর্য, প্রতিবাদ নেই তাঁর। প্রাচীন লেখক প্রশান্তভাবে সবটাই প্রাপ্য

বলে মেনে নিয়েছেন। আমাকে দেখে হাসলেন। "কোনও ক্ষতি করিনি," ব্যস, আক্ষেপ মাত্র ওইটুকুই, আর কিছু নয়।—কে জানে, তিনি বলছিলেন, হয়তো এই ভালো। ছুটেছিলাম খুব, ছুটেছি অনেক দিন, এবার স্থিতি। যিনি হৃদিস্থিত, তিনি হয়তো আমাকে এখন তাই দিতে চান। এতে হয়তো আমার ভালোই হবে। শিল্প-স্রষ্টা হিসেবে? না, শিল্পসৃষ্টির কথা এখন আর ভাবি না মানুষ হিসবে। শিল্প ইত্যাদি রচনা পূর্ণ হওয়ার একটা উপায় বটে, কিন্তু পরিপূর্ণতা নয়। এই যে বাইরের বস্তুগুলো চলে গেল আমার চারধার থেকে, কিংবা আমিই চলে এলাম তাদের কাছ থেকে, এতে আমার উপকার। সংহত-সংযত জীবন-চর্চার মধ্য দিয়ে আমাকে আরও পাব। সব নিয়ে যতদিন ছিলাম ততদিন নিজেকে তো পাইনি, তৈরী করতে পারিনি। এখন ভাবছি সুন্দর জীবন, সে-ও একটা রচনা। মানুষ হিসেবে বড়ো হওয়াটা একজন বড় শিল্পী হওয়ার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

আপনার ভয় হয় না, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার এই যে এত লেখা, এ হয়ত নষ্ট হয়ে যাবে, কেউ বলবে মিথ্যে, হয়তো তেমন আদর থাকবে না—।

মনিময়বাবু মাথা নাড়লেন।—ভয়? আগে ছিল। খুব প্রাণ দিয়ে সর্বস্ব ঢেলে একটা কিছু লিখলাম, লোকে হয়তো তেমন নিল না, আমার অনেক লেখাই সে-রকম চলেনি, জানোই তো সেই অবহেলা বুকে বাজত। উপেক্ষিত রচনা-গুলোর প্রতি আমার মায়া ছিল বেশি, অপটু ব্যর্থ সন্তানের প্রতি যেমন মায়ের থাকে। তখন ভেবেছি এখন না হোক, আমার মৃত্যুর পর এগুলোর অর্থ আবিষ্কৃত হবে, আর কেউ না পড়ুক, আমার ছেলেরা পড়বে। কিন্তু সম্প্রতি এক একটা আঘাতে আমার সেই মোহ আর মায়া একেবারে ভেঙে গেছে আমি উত্তীর্ণ হয়েছি সত্যতর একটা প্রতীতে। এখন জানি, আমিই যদি গেলাম, তবে আমার রচনার কী রইল কী গেল, তাতে আমার তো কিছু এসে যাবে না! চিতার ধোঁয়াই কি শেষ অবধি কাউকে ধাওয়া করতে পারে? পারে না। লেখাও তো এ পারেরই ব্যাপার, আশা-বাসনা এই সব মিলিয়ে তৈরী খেলনা, তাই ও-সব নিয়ে আর বিশেষ ভাবছি না। ভাবছি আমাকে নিয়ে, আমাকে তৈরী করে নিতে হবে, তার সুযোগ এসেছে, বাইরের সব দুয়োর যখন ফটাফট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন খিল এঁটে নিজেকে নিয়েই যাপন করছি নব-বাসর, এই বৃদ্ধ বয়সে। মানুষের একান্ত সহধর্মিণী সে নিজেই। আবার তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কী জানো? না, সন্তানাদি নয়, শিল্প-কীর্তিও না, মানুষ নিজেই মানুষের শ্রেষ্ঠ সন্তান। নিজেই নিজের প্রিয়া ও আত্মজা। এখন তাকেই নির্মাণ করা আমার সাধনা। আমি যাবার পরে আমার চটিজুতো, জামা কলম থেকে লেখা-টেখা যা থাকবে, তা কি আমাকে স্পর্শ করতে পারবে? মনে তো হয় না।

সর্বেশ বলল, মণিময়বাবুর বরাবরই একটা হাই-ফিলজফি। কিন্তু আমরা, লেখকেরা, এই ১৯৫১-এ কী ভাবে আছি, কী-রকম বেঁচে আছি, তার একটা

দলিল, একটা আলেখ্য রচিত হবে না? উনি না-হয় এক বিশ্বাস থেকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন অন্য বিশ্বাসে; কিংবা সব বিশ্বাসের বাইরের নির্বেদে। আর চতুর্দিকে যারা এই সব ঘটাচ্ছে, তারাও প্রতিষ্ঠিত তাদের নিজ-নিজ সামাজিক-রাজনৈতিক বিশ্বাসে, কিন্তু আমরা? সব বিশ্বাস-ভক্তি থেকে নির্গত বহিষ্কৃত যারা? তারা কি হয়ে যাবে একঘরে, পারিয়া? তাদের সংশয়, যন্ত্রণার কোনও প্রামাণিক চিত্র ভাবীকালের প্রদর্শনীর জন্যে রেখে যাবে না?

একটু বিরতি দিয়ে সর্বেশ বলল, আরও আছে। সম-সময়, তার প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য নেই, তার ব্যাখ্যাই যদি না করি, তবে আমরা লেখক কিসে, শিল্পী হিসেবে কিসের অভিমান? আমাদের কালের সব চেয়ে আত্মস্থ স্রষ্ঠা যিনি, সেই রবীন্দ্রনাথও কিন্তু—

বললাম, মণিময়বাবুকে সেকথাও বলেছিলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার করে বললেন, তাঁর কথা এনো না। 'যাব চলে হাসি মুখে, যাব নীরবে', অনায়াসে এই কথা যিনি লিখেছেন, তিনিই আবার মৃত্যুর ক'মাস আগেই বিশ্লেষণ করলেন সভ্যতার সংকট, সম-কাল সম্পর্কে তাঁর শেষ টেস্টামেন্ট। আগেও করেছেন। বলে মনিময়বাবু তাক থেকে নামিয়ে আনলেন "বিসর্জন" নাটকটা মাঝে মাঝে পড়ে পড়ে শোনালেন। সেইসব জায়গাগুলো—

......"ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা
সমস্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা,
সমস্ত ভায়ের প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া।"

তারপরঃ ... ...

"রাজ্যের মঙ্গল হবে?
দাঁড়াইয়া মুখোমুখি দুই ভাই হানে
ভ্রাতৃবক্ষ লক্ষ্য করে মৃত্যুমুখী ছুরি—
রাজ্যের মঙ্গল হবে তাহে? রাজ্যে শুধু
সিংহাসন আছে—গৃহস্থের ঘর নেই,
ভাই নেই, ভ্রাতৃত্ববন্ধন নেই হেথা?"

অবশেষে আবারঃ

... ...

করিব প্রণাম, দয়াময়ী মা বলিয়া
ডাকিব তোমারে। তোর পরিচয় কারো
কাছে নাহি প্রকাশিব, শুধু ফিরায়ে দে
মোর জয়সিংহে!......

......দেবী বল তারে?
পুণ্যরক্ত পান করে সে মহারাক্ষসী
ফেটে মরে গেছে।

বই বন্ধ করে মণিময়বাবু বললেন, অন্য কালে, অন্য প্রসঙ্গে লেখা, তবু আজ যখন পড়ি, তখন এর মধ্যে নতুন তাৎপর্য, নতুন প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাই। চারধারের সব ব্যাপারের সঙ্গে চমৎকার মিল যাচ্ছে, না? একে বলে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি, দিব্য-দর্শন। কিংবা এ-ও হতে পারে, সবই এক থাকে, সব ঘটন-অঘটন আর ভাবনা, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ মিলিয়ে সবই চিরন্তন?

—অর্থাৎ শুধু সময় বদলাচ্ছে, তার ভিতরের ব্যাপারগুলো নয়? খালি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ওল্টাতে হচ্ছে, কিন্তু লেখাপড়া একই রয়ে যাচ্ছে? মানুষ এগোচ্ছে না?

মণিময়বাবু বললেন, তা বলা যায় না। কখনও মনে হয় এগোচ্ছে, কখনও ভয় হয়, বুঝি পিছিয়ে যাচ্ছে। দ্যাখো, মানুষ সৃষ্টির পর কত খণ্ড প্রলয় তো হল, তুষার ধস, ভূমিকম্প, তখনকার মানুষ হয়তো কেঁপে গেছে—এই শেষ' সব লুপ্ত হয়ে যাবে।' কই, ধ্বংস হয়নি তো। মানুষ আজও আছে। আছে যেমন বহির্জগতের দুর্যোগের পর, তেমনই অন্তর্জগতের নানা সর্বগ্রাসী বৃত্তি ও বিনাশী চিন্তাধারার পরও মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট আছে। বরং বাড়ছে। ঝড় জলের রাতে দিশাহারা নৌকার মাঝি পার পায় না, এই বুঝি সব ডোবে, তবু সে-ও হয়তো ভোরে দ্যাখে, কই ডোবেনি তো। দু'ধারে সবুজ খেত, গাছের নীল জটলা, সকালের পাখি, আর নৌকাটা কী আশ্চর্য, অতো দুর্যোগের মধ্যেও খানিকটা এগিয়েছে! আমরা মোটের ওপর এগোচ্ছি, এখন-তখন যত পিছু· হঠাই ঘটুক না কেন, সব সাময়িক। সেই অঙ্কের বাঁদরটার মতো আর কী। খুঁটি বেয়ে বেয়ে সে অনেক ওঠে, খানিক নামে। যতটা উঠেছিল ততটা নামে না কিন্তু, কিছুটা হাতে থেকেই যায়, পরে মোটের ওপর হিসাব মিলিয়ে দেখি, সে কিছুটা উপরেই আছে। উঠছে। উঠছি আমরাও—মায়াহীনতা, মূঢ়তা আর হিংসা নিয়ে আদিম মানুষ যারা ছিল তারা আর আমরা এক নাকি? তবে—একটু অপেক্ষা করে মনিময়বাবু বললেন—এই মুহূর্তে আমরা হয়তো নামছি, সেই পিছলে পড়ার সময়টা এসেছে হয়তো, চলছে। চারিদিকে ঘোর দুর্যোগ দেখি। পরে উঠব, নামব না মোটের ওপর, বুঝলাম। কিন্তু সেই সত্য সত্ত্বেও এখন যারা পড়ে যাচ্ছে, তাদের সান্ত্বনা কী? এখন যারা অন্ধকারে, কী ভরসা তাদের এই ভেবে যে, ভোর আছে, ভোর হবে! বলতে পারো বটে। আমরা সেই সন্ধিক্ষণে, ক্রান্তিকালে, সেই সংকট-সংশয়ের সময়ের হাতে পড়েছি। যে-মানুষ আজ মারা যাচ্ছে, কালকের ইতিহাস ধুয়ে খেয়ে সে কোন্ সুখ পাবে? বলতে পার বটে।

সর্বেশ বলল, ইতিহাসে বিদ্যুৎবাবুরও বিশ্বাস নেই। সেদিন যেতে তিনি আমাকে গীবন কোট্ করে বললেন, হিষ্ট্রি ইজ লিট্‌ল মোর দ্যান দি রেজিষ্টার অব দি ক্রাইম্‌স, ফলিজ অ্যান্ড মিসফরচুনস্ অব ম্যানকাইনড্।

—বিদ্যুৎবাবুর হয়তো বিশ্বাস নেই মনিময়বাবুর মতো। আজকাল তো শুনি, তিনি খালি "ফ্রগ্‌স্" পড়ছেন।

If you look at the stuff that is written today
And the stupid things our statesmen say,

পারলেই এই সব শুনিয়ে দেন। পড়ে যানঃ

They sit at the feet of Socrates
Till they can't distinguish the wood from the trees,
And if things don't go well, if these good men
All fail, and Athens comes to grief, why then
Discerning folk will murmur (let us hope) :
She's hanged herself—but what a splendid rope :

—এথেন্‌স, এথেন্‌স, আর ওঠেনি। "দে সিট অ্যাট দি ফীট অব সোক্রাটেস্। আমাদের রাষ্ট্রে অনেকে যেমন গান্ধীর চরণে প্রণত হয়ে আছেন।

—গান্ধী, গান্ধী, আমি বললাম, ব্যক্তিগত সাহসের শেষ দৃষ্টান্ত।

—কিন্তু পরিত্রাণের শেষ পথ কী। ব্যক্তিগত সাহসের কাছাকাছি দৃষ্টান্ত তো আমাদের মধ্যেও আছে, সৌর। সে যা প্রয়োজন বোঝে তাই লেখে, নির্ভয়ে যথাতথা ধায়, যেখানে হাঙ্গামা খুনোখুনি সেখানেও। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করেছে আমাদের মধ্যে একমাত্র সেই।

—সৌরের জন্য আমি গর্বিত; বললাম।

—গর্বিত আমিও। ব্যক্তিগত নির্ভয়তার মূল্য আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এ-ও ভাবি, সামগ্রিক উদ্ধারের বাস্তব রাস্তা ওইটেই কি? হয়তো নয়। ওই সাহসকে মুছে দিতেও স্পর্ধিত হিংসা এগিয়ে আসে, এসেছে! গান্ধীজীর শেষ প্রাপ্তি তিনটি গুলি। তবু যারা এই সাহস দেখান, ছোট্ট একটি দীপ জ্বালিয়ে দেন অন্ধকার ঘরে, তাঁদের নমস্কার করি। মনে মনে বলি, এই নিঃসঙ্গ দৃষ্টান্ত দিয়ে হয় না ঠিক, আবার এ-ও ঠিক, এগুলো নইলেও হত না, কিছু থাকত না, বাঁচত না।

বললাম, আর ওই মনিময়বাবুদের অচাঞ্চল্য? ওরও বোধহয় কিছু মূল্য আছে। সেদিন 'বিসর্জন' খানা মুড়ে রেখে হেসে বললেন, আমার জন্যেই তোমরা ভাবিত, কিন্তু আজ রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে কী হত বলো তো? যখনই ভয়ানক কিছু ঘটে, তখনই ভাববে, এর চেয়েও ভয়ানক কিছু ঘটতে পারত। অমনই স্থিরতা পেয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ আজ বর্তমান থাকলে তারও প্রাণের জন্য আমাদের থাকতে হত সশঙ্কিত। শুধু তাঁর কয়েকটা মূর্তি গেছে, কিন্তু

তিনি তাঁর প্রতিমূর্তি নন তো।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, মনিময়বাবুদের এই অচাঞ্চল্য আর সৌর-র ওই সাহস। আলাদা আলাদা ভাবে হয়তো বেশি কিছু নয়, কিন্তু যোগ দিয়ে যদি যাই? ছোট ছোট অঙ্কের যোগফলে কিছু কি পাব না? আজ আমরা বিচ্ছিন্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে সব্বাই—আত্মপর, আত্মগত, আত্মরক্ষায় বিড়ম্বিত। সমাজের এলিট যেন অ্যাবডিকেট করেছে, চিন্তানায়কেরা ত্যাগ করেছেন কর্তব্যভার—সবাই মূক সবাই চুপ তারই একটা ফল এই। কিন্তু মানুষ কেন ছোট ছোট দ্বীপের মতো পরস্পর থেকে সরে থাকে নির্বাক পাংশুমুখে? সকলের কাছাকাছি আসবে না কেন? কেন দ্বীপগুলি ঘনিষ্ঠ হয়ে একটা সাহসের মহাদেশ রচনা করবে না?

তার পিঠে হাত রাখলাম আমি।—সর্বেশ, ওঠো।

সে মুখ তুলে বলল, তুমি আমার পাশেই আছ?

বললাম, আছি। পাশাপাশি দাঁড়িয়েছি। সর্বেশ, একদিন ছিল, যখন তোমার সাফল্যে সার্থকতায়, শক্তিতে হয়তো একটু ঈর্ষাও করেছি তোমায়। কিন্তু আজ কোনও ঈর্ষা নেই, কোনও মালিন্য না; এই দুর্দিনে সমভাগী আমরা সবাই সমান।

॥ নয় ॥

সে ফিরছে, সে ফিরছে, বুক টান করে, লম্বা লম্বা পা ফেলে এবং এই অনর্গল কথা আর ভাবনা-সমষ্টির আমি কিংবা সে, এই লেখাটা যার জবানী। সে ফিরছে অন্ধকারে, কিন্তু দূরের কোনও দীপ লক্ষ্য করে। দীপ কোথায়, দিগন্তে? একটা একটা তারাও হতে পারে। সে ফিরছে স্বপ্নঘোর থেকে জাগরণে, পুনর্বার উপদ্রুত শহরের ভয়বর্জিত একটা ঘরে। ভয়? আর নেই, ততটা নেই। বিনীতাদের বাড়ি সে আশ্রয় নিয়েছে বটে, ছাদের পাশের চিলেকুঠিতে, আরও নিরাপদ কোথাও সে গিয়ে উঠবে-উঠবে ভেবেছিল না, কোথাও আরও উচ্চচূড়ে? তার আর দরকার নেই। শহরের বহু মানুষ আজকাল বাড়ি নিচ্ছে কেন্দ্রীয় এলাকায়, অলক্ষ্য এক বাস্তুত্যাগ কবে থেকেই চলছে, আর্ত বিপন্ন নাগরিকের দল ছুটছে, খুঁজছে আশ্রয়, শরীরের সব রক্ত যেন জড়ো হচ্ছে হৃৎপিণ্ডে, অস্বাস্থ্যকর, ভয়ংকর—কিন্তু তার আর সেই নিশ্চিন্ত নীড়ের প্রয়োজন নেই। এই সময়ই কেড়ে নিচ্ছিল তার সব কিছু। সেই সময়ই আবার একটু-একটু করে সব ফিরিয়ে

।

আস্তে আস্তে চোখ মেলল সে, ক্লান্ত অলস, তবু দীপ্ত। যে সন্ধ্যারাত

মিলিয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে তার চোখের ঠোঁটের এখন মিল আছে।

—বিনীতা? সে ডাকল মৃদু স্বরে। সাড়া পেল না। বোধহয় ফেরেনি এখনও। অথচ দিন তো গড়িয়ে...উঠে সে চোখে জলের ঝাপটা দিল। তাকাল খাটটার দিকে। খাটটাকে এই ক'দিন দেখলেই তার মনে হত যেন একটা শব-পালঙ্ক, অথচ আজ হালকা লাগছে।

হালকা সে বোধ করছে ভিতরেও। সে এখন গুণ গুণ গানও গাইতে পারে। গায়নি, কত দিন। নির্নিমেষে দেখতে পারে ঘরটার কোণে মাকড়সার জাল-বোনার অধ্যবসায়। ভালো লাগছে। তৃষ্ণা জাগছে—কিসের? চায়ের নয়, হয়তো চোখে দেখার। (বিনীতা, তুমি এখনও আসছ না কেন)।

হালকা একটা ঠাট্টাও করতে পারে, কত দিন যেসব চপলতা করেনি। যেন ভয়ের বিড়ালটা তাকে নিয়ে ইঁদুরের মতো আর খেলছে না।

অনেকদিন পরে পরদা ঠেলে বারান্দায় দাঁড়াল সে, রাস্তায় আলো নেই, কারা হয়ত নিবিয়ে দিয়েছে কিংবা জ্বলেনি। কিন্তু হাওয়া বইছে ঝিরঝির। আধফোটা একটু জ্যোৎস্না। এরা শহরের সব সর্বনাশ, চাপা-চাপা সব চক্রান্তের বাইরে। মানুষেরাও পারে না কেন সব অস্বীকার করে উচ্চতায় নির্ভয়ে উঠে যেতে, যেমন পারে পাখি?

বিনীতা যেই আসবে তাকে দেখে অবাক হবে। এমন স্বচ্ছন্দ, সহজ তাকে কখনও দ্যাখেনি। পাথর সরে-যাওয়া গলায় সে বলবে, বিনীতা তুমি সারা দুপুর আর সারা দিনে ছিলে না, আবার ছিলেও। সারা দুপুর আমি তোমার সঙ্গে ঘুমিয়েছি।

—বিনীতা কী বলবে?—যান, আপনি ভারী বিশ্রী কথা বলেন? কিংবা কথা না পেয়ে কাপড়ের পাড়ের সুতোগুলো আলাদা করবে?

করুক, কিন্তু উৎফুল্ল গলায় সে তখনও বলতে থাকবে,—তাই যে হয়। যখন একলা, তখন যাদের চাই তাদের এই ভাবেই কাছে টেনে নিই, পালা করে শুই প্রত্যেকের সঙ্গে। আমার ভাবনা আর বাসনা দু'টি বাহু হয়ে ওঠে।

আজও উঠেছিল। একে একে এল ওরা সবাই—লীলা, সীতা ইত্যাদি; সব শেষে তুমি, তারপর অ—নে—ক্ষণ? কেবল তুমি। ওরাও ধরা দিয়েছিল কিন্তু। আজ। মাঝখানে এই ক'দিন দিচ্ছিল না। সরে সরে যেত, মনের মুঠো থেকে পিছলে। এই কয়দিন আমি মনে খুব ছোট্ট হয়েছিলাম যে, এবং সেই হেতুই ছিলাম অশুচি। মন যখন অশুচি, তখন সুন্দর স্মৃতিরা ধরা দেয় না, সুন্দর মেয়েরা সেখানে ছায়া ফেলে না। আজ ফেলল, এই তো একটু আগে, সর্বেশের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যখন ফিরে এলাম। তখন শুচি, তখন মনের থোকা থোকা ফলে পাখির ঠোঁটের মতো ওদের পীড়ন। পীড়ন, সুখ-শিহরণ। আজ। এখনই। মৃত প্রেম সব সহসা বেঁচে উঠেছিল।

হ্যাঁ, প্রেমও মরে যায় বিনীতা, নিঃশেষে, নিষ্ঠুরতম ভাবে। প্রেম মরে নির্বিকার নিঃসাড় পাথর হয়। আমি দেখেছি। সীতা লীলাদের চোখে। ওদের

চোখের মনি পাথর। সেই পাথরও জ্বলে উঠল' দেখেছি আজ, কারণ আজ আমি আবার পুরুষ যে; না, তার চেয়েও বেশি; আমি আবার মানুষ। ভিতরে তার আবির্ভাব বোধ করছি। একাকীত্বকে আগে মনে হত আততায়ীর মতো; ঘর অন্ধকার হলেই যে আমাকে আক্রমণ করে। অনেক দিন পরে সেই একাকীত্বই বাঙ্ময় হল আবার এবং সঙ্গিনী।

দূরে ফটফট্ আওয়াজ, বারান্দায়, দাঁড়িয়ে সে শুনছিল। নেবানো পরিবেশে আনাচে-কানাচে কালো ভালুক যেন নাচছিল। শিটি বাজল কোথায়, বোধ হয় রাস্তার মোড়ে। আশেপাশের তিনদিকের তিনটে গলি থেকে তিনটে ছেলে চকিতে বেরিয়ে এল। তারা পরস্পর কী বলল ফিসফিস করে, চোখে চোখে, পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটা গাড়ি প্রচণ্ড গর্জনে ধেয়ে আসছিল। কালো গাড়ি, পুলিসের। ধাঁ করে নামল দু'জন সিপাহী, এদিক ওদিকের গলিতে সাঁ-সাঁ করে ঢুকে গেল। আর য়ুনিফর্ম-পরা এক অফিসার ততক্ষণ রিভলভার হাতে পাহারা দিতে থাকল।

ফিরে এসেছে পাহারাদার দু'জন, অফিসারকে কী যেন বলছে। ওরা উঠে পড়েছে এখন, পুলিসের গাড়ি আবার স্টার্ট দিচ্ছে। বাঁক ঘুরে গাড়িটা অদৃশ্য হল, তাই দেখে, সামনের রকে ভিখারীমতন একটা লোক, যে উঠে বসেছিল, যে ফের চাদরে আগাগোড়া নিজেকে ঢেকে ভাবলেশহীনভাবে শুয়ে পড়ল।

এই দৃশ্য, এখনকার কলকাতায়, সন্ধ্যার, মাঝ রাত্রির। ছায়াছবির মতো। কিছুটা ভৌতিক। রিকশাওয়ালা যাচ্ছে একটা, তার হাতের ঘুণ্টি ভাল করে বাজছে না। তার মানে সওয়ারী নেবে না সে এখন, দূর পাল্লার যাত্রী তো নয়ই, ওই দ্যাখো, সামনে একজন এসে দাঁড়াতেই রিকশাওয়ালা মাথা নেড়ে নেড়ে পালাচ্ছে।

দূরে চিৎকার—বিকট, মরণাপন্নের আর্তনাদের মতো। 'হরিশ বোধহয় খতম হল', সামনের ছাদে-দাঁড়ানো একটা মূর্তি পাশের ছাদের কাউকে লক্ষ্য করে বলল। ওরা কি অন্তর্যামী, না নির্ভুল শ্রুতিধর, না দেখেও, শুধু মৃত্যু-মুহূর্তের আওয়াজ শুনেই নিহতকে সনাক্ত করে দিতে পারে? অথবা এই শক্তি এই অ্যাডাপটেবিলিটি অর্জন করেছে দিনে দিনে,—কলকাতায় এই পাড়ায় ক্রমাগত বসবাস ওদের এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী করেছে?

১৯৭১—কলকাতা। কেমন ভাবে আছি, লেখা দরকার, সর্বেশ বলছিল। কেমন করে, বেঁচে না মরে, না মরে মরে?

বিনীতা এখনও ফেরেনি। তার ভয়টা সেই কারণে ফিরে এল নাকি, ভয় কি এইভাবেই ফেরে, পালাজ্বর যেমন বারে বারে আসে?

না, সে শক্ত হয়ে দাঁড়াল সে, জয় করবে। শক্ত তার মুঠি, শক্ত কপালের

তোমাদেরও মনকে বদলাতে হবেই। এই সমাজ আর ব্যবস্থা "নারীরে করেছে বেশ্যা, পুরুষেরে করেছে ভিখারী", পড়েছিলাম অনেকদিন আগে। ইতিমধ্যে আরও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে, ভিখারীদেরও একটা বিরাট অংশকে বানিয়েছে হত্যাকারী, চেনা যায় না আজ কে রক্ষী, কেই বা ভক্ষী।

তোমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে বিনীতা, পেলাম এই সময়কে। সময়, আমার সময়, খানিক আগেও যার আর একটা নাম ছিল ভয়। ঢের দিন কেটেছে, দিন আর রাত, রাত আর দিন, ভয়ের সঙ্গে উঠ-বোস্ করে, শুয়েশুয়ে।

ভয় কিসের? মৃত্যুর। মরতে ভয় নেই বলে বলে আবার ধাপ্পাও দিয়েছি নিজেকে। আসলে বাঁচতে না লাগে না, এই অবক্ষয়ী অবসাদকে, এই বিলাসী ভাবনাকে ভেবেছি মৃত্যু-ইচ্ছা রূপে। দুটো আলাদা কিন্তু। বাঁচতে ভাল না লাগা আর মরার সাহস একেবারে বিভিন্ন। একটা নঙর্থক, সদর্থক আর-একটা। দ্বিতীয়টাকে চিনেছি।

চিনেছি বলেই তো সোজাসুজি চেয়ে বলতে পারছি, তোমাকে আর ভয় নেই, সময়, তোমার আর একটা নাম মৃত্যুও যদি হয়!'

পার হয়ে যাচ্ছি, এখনও অনেক পথ বাকী সেই পৃথিবীর, যেখানে ধুলো ওড়ে, মেঘ জমে, বৃষ্টি হয়। কত কাল নিজেকে আটকে রেখেছিলাম বন্ধ ঘরে, মেঘ-বৃষ্টি-রোদ কিছুই দেখতাম না। দেখব আবার, কিন্তু কতদূর গিয়ে, সেই মর্গে?

তা-হলেও ভয় নেই। এই সাহসটুকু যদি বাঁচাতে পারি, তবে সেখানেও.. কারা? যারা মরেছে, যারা মেরেছে? সেই মর্গই যদি হয় নিয়তি তবু সেখানেও প্রবেশের পর অপর দিকে আর-একটা দরজা কি কেউ খুলতে দেবে না? খোলা হাওয়া, ঝিরঝির বৃষ্টি, সেই ঘাসে-ছাওয়া জগতে ছেলের নিষ্পলক চাহনিকে ভয় পেয়ে পিতা আত্মঘাতী হয় না; নিহত পুত্রের জন্যে, আততায়ীর শাসানি সত্ত্বেও, কোনও মায়ের গলা খুলে কাঁদতে বাধছে না।

আর চন্দ্রালোকে ঘাসে যে ছুরি মুছেছিল, সেই ছেলেটি? তাকেও বলব নাকি 'আমাকেও যদি মারো, ক্ষতি নেই, কারণ একবার মরলে দ্বিতীয়বার তো মরতে হয় না! কিন্তু একবার যে মেরেছে তাকে বারবার মেরে যেতে হয়। মরতেও হয় দীর্ঘকাল ধরে।' প্রতিশোধের আগুন পুষে রাখা, আর জ্বলতে থাকা অহোরাত্র, সেও নিরন্তর মৃত্যু, ঢের বেশি তার যন্ত্রণা। তার পরে তাকে আবার বলব—আমার যন্ত্রণা তুমি হয়তো দেখতে পাও না, কিন্তু আমি দেখতে পাই তোমার দাহ আর দ্বন্দ্বকে, ভালও বুঝি বাসতে পারি সেই কারণে, যদিও তুমি আমাকে ভালবাসতে পারছ না। নাই বা বাসলে, বেসো না, আমি তো জেনে নিয়েছি আমাদের দু'জনের ক্ষমতার এই তারতম্য, তোমার উপর আমার জিৎ কোন্‌খানে।'

এসব বলতেই যা দেরি হয়ে যাচ্ছে, নইলে আমি খুঁজে তো পেয়ে গেছি আমার সময়কে। সে তার কথা শেষ করল এইভাবেঃ "আমি ফিরে আসছি, আমি আসছিই, শুধু তুমি যেন আশা ছেড়ে দিয়ে বোসো না। তুমি বেঁচে থেকো, বিনীতা, তুমি অপেক্ষা করে থেকো।"